কুল-পুরোহিত

ও

অন্যান্য গল্প

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

কলিকাতা

ইণ্ডিয়া প্রেস

১৩২৩

পাব্লিশার

শ্রীচিন্তাহরণ গুহ

গৃহস্থ পাব্লিশিং হাউস

২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি,

প্রিণ্টার

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়া প্রেস

২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি,

কলিকাতা।

[illegible]

উৎসর্গ পত্র

স্নেহাশীর্ব্বাদভাজন
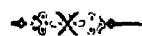
শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ রায়

সুহৃদ্বরেষু—

প্রিয় অমর বাবু !

যখন নানা কারণে সাহিত্য সাধনা ত্যাগ করিয়া এক প্রকার নির্জ্জনবাসী হইয়াছিলাম, তখন আপনি আমাকে জোর করিয়া আবার সাহিত্যের আসরে টানিয়া আনিয়া ছিলেন। এক্ষণে আপনার কৃতকার্য্যের ফল আপনিই ভোগ করুন।

গুণমুগ্ধ,

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন
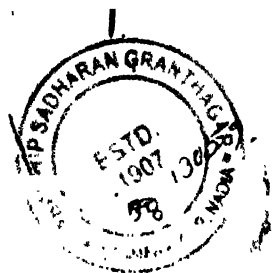
প্রায় আট বৎসর পরে আবার আমার সাহিত্য সাধনার এই নূতন উদ্যম। এই উদ্যমের ফল "কুল-পুরোহিত"। সুবিখ্যাত "গৃহস্থ" মাসিক পত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামরাখাল ঘোষ মহাশয় নিজ অর্থব্যয়ে এই পুস্তকখানি লোক-সমাজে বাহির করিয়া আমার অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গল্পগুলি পূর্ব্বে প্রবাহিণী, স্বদেশী, অর্চ্চনা, অর্ঘ্য, জন্মভূমি প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে একত্র গ্রথিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

কুল-পুরোহিতের সমগ্র স্বত্ব রামরাখাল বাবুর। আমার ইহাতে কোন স্বত্ব নাই।

কলিকাতা।
ভাদ্র, ১৩২৩ সাল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

কুল-পুরোহিত

(১)

গ্রাম্য দলাদলিতে যখন সমাজের সকলেই একে একে মহেশ বাবুর পক্ষ ত্যাগ করিল, তখন পুরোহিত সীতানাথ শর্ম্মা একা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিল। এদিকে সমাজের লোকদের মত কমলাদেবীও তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। জ্ঞাতিবিরোধে বিষয়-সম্পত্তি প্রায় সকলই চলিয়া গিযাছিল, তথাপি সম্পত্তি-ঘটিত মোকদ্দমার অবসান হয় নাই। আদালতরূপ গুরুভুজ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ সমস্তই গ্রাস করিয়া শেষে তাঁহাকে ঋণের পাশে বেশ করিয়া বাঁধিতেছিল। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান্ লোক মাত্রেই যে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অট্টালিকা পতনোন্মুখ হইলে সকলেই তাহার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সরিল না কেবল একজন; তিনি মহেশ বাবুর কুল-পুরোহিত সীতানাথ ভট্টাচার্য্য। সীতানাথ এই ভগ্নপ্রায় অট্টালিকাকে সবলে জড়াইয়া রহিলেন; যেন তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তিতে গৃহখানিকে আসন্ন পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, অথবা তাহার সহিত আপনিও ধূলিসাৎ হইবেন।

বিপক্ষ দলের কর্ত্তা ভৈরবচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার পুত্র যদুনাথের

চরিত্রদোষ লইয়াই দলাদলি বাধিয়াছিল। এক্ষণে ভৈরব বাবুর পক্ষই বলবান্। তিনি একদিন হাসিতে হাসিতে সীতানাথকে বলিলেন, "ঠাকুর, যে গাছ ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ফলের প্রত্যাশায় আর তাহার শূন্য তলায় কেন ?"

সীতানাথ উত্তর করিলেন, "এখনও গাছের মূল আছে। জল ঢালিলে একদিন সে গজাইয়া উঠিতে পারে।"

ভৈরব। তাতে আর তোমার স্বার্থ কি ?

সীতা। আমার স্বার্থ সম্পূর্ণ।

ভৈরব। কি রকম ?

সীতা। আমি যে তার পুরোহিত।

কিন্তু বিধাতা বুঝি গাছের মূলটুকু পর্য্যন্ত রাখিতে রাজি নহেন। আর্থিক ও মানসিক ক্লেশে নিপীড়িত মহেশ বাবু যেদিন পার্থিব বিচারালয়ের ব্যয়ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মহাবিচারকের উচ্চ বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন, সেদিন সীতানাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হায়, মহেশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি মিত্রবংশের মান-মর্য্যাদাও যায়। যাইবারই আর বাকী কি ? তখনও যে যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, মহাজনে দেনার দায়ে তাহা বেচিয়া লইল, কতক বা জ্ঞাতিরা আত্মসাৎ করিল। রহিল কেবল ভদ্রাসনখানি, আর রহিল মহেশবাবুর দশমবর্ষীয় পুত্র নৃসিংহচন্দ্র ওরফে নসু। তাহাকে দেখিবার শুনিবার জন্য থাকিল, মহেশবাবুর বিধবা ভগিনী নিস্তারিণী। মহেশবাবুর স্ত্রী নসুকে প্রসব করিবার অল্পদিন পরেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি নিস্তারিণীর কোলেই নসু প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল।

বাড়ীখানা খুব বড়, দুই মহল। কিন্তু বাড়ীর ইট কাঠ খাইয়া তো

জীবনধারণ করা যায় না! এজন্য নিস্তারিণী একদিন সীতানাথকে বলিল, "পুরুতকাকা, বাড়ীটা বিক্রী করে দাও।"

সীতা। কেন?

নিস্তা। এত বড় বাড়ীতে আমাদের দরকার কি? তা ছাড়া বাড়ীখানা বেচ্‌লে—

সীতা। দু'চার হাজার টাকা পাওয়া যেতে পারে; কেমন?

নিস্তা। হাঁ; সেই টাকায় কোথাও একটু কুঁড়ে বেঁধে দুজনের পেট চালান যেতে পারে।

সীতা। তা হ'তে পারে না নিস্তার, প্রাণ থাক্‌তে আমি মহেশ মিত্রের বাড়ী বেচ্‌তে দেব না।

নিস্তা। কিন্তু চল্‌বে কিসে?

সীতা। দামোদরজী চালিয়ে দেবেন।

দামোদরজী মহেশবাবুর গৃহদেবতা।

নিস্তারিণী বলিল, "দামোদরজীর নিজেরই যে সেবার অভাব।"

সীতা। তিনিই তার ব্যবস্থা কর্‌বেন।

নিস্তা। রহস্য নয় কাকা, আমরা বরং একদিন উপোষ ক'রে থাক্‌তে পার্‌ব, কিন্তু দামোদরজীর উপবাস দেখ্‌তে পার্‌ব না। তুমি এক কাজ কর, দামোদরজীকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাও।

মৃদু হাসিয়া সীতানাথ বলিলেন, "ওরে বাপরে, এত বড় বাড়ীর ঠাকুরকে কি আমার কুঁড়েয় নিয়ে যেতে পারি!"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তারিণী বলিল, "তবে কি হবে কাকা?"

সীতা। হবে আর কি? যেমন চল্‌ছে তেমনই চলুক।

(২)

দামোদরের আর সে ভোগারতির বন্দোবস্ত নাই, নিত্য-পূজার

এক সের চাউল পর্য্যন্ত জুটে না। তথাপি সীতানাথ নিয়মিত রূপে দুই বেলা ঠাকুরের পূজা-আরতি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সীতানাথ প্রত্যহ প্রভাতে কতকগুলি চাউল কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া, তাহা গুপ্তভাবে রাখিয়া যজমান বাড়ীতে যাইতেন। পূজা শেষে তিনি কখন সে চাউল ফিরাইয়া আনিতেন, কখন বা আনিতেন না। নিস্তারিণী তাহা লইয়া যাইতে বলিলে বলিতেন, "আজ অমুক গ্রামে বড় জরুরী কাজ আছে। পারিত কাল নিয়ে যাব। আর তোমাদের দরকার হয়—খরচ করিও, পরে একেবারে সব হিসাব করিয়া লইব।"

ব্রাহ্মণের মনোভাব বুঝিয়া নিস্তারিণীর চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ জল গড়াইয়া পড়িত।

সীতানাথের এরূপ জরুরী কাজ প্রায়ই আসিত, আর সেই পূজার চাউলে নিস্তারিণীর ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। নন্থ তাহার ভাগ লইত না। কারণ সীতানাথ পূজা শেষ করিয়া লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য নন্থকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। নন্থ সেখানে সারাদিন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় পুরুতদা'র সঙ্গে নিস্তারিণীর কাছে আসিত।

নন্থর শিক্ষাদাতা সীতানাথ স্বয়ং। কিন্তু নন্থ তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষার নীরস তাড়না অপেক্ষা স্নেহের সুকোমল তাড়নাই অধিক পরিমাণে পাইত। আর সমস্ত দিনে সে যতটা জ্ঞান লাভ না করিত, তদপেক্ষা অধিক মিষ্টান্ন লাভে কোন দিনই বঞ্চিত হইত না। কাজেই নন্থ এই বিচিত্র শিক্ষাদাতার সমধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এইভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেলে সীতানাথ দেখিলেন, তাঁহার পরিমাণাধিক স্নেহরস বা মিষ্টান্নরসে নন্থর দেহখানি যেমন পরিপুষ্ট হইতেছে, জ্ঞানের সেরূপ পরিপুষ্টি হইতেছে না। তাঁহার প্রদত্ত অন্ন নন্থকে আপাতযন্ত্রণাকর অভাবের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু

উহার ভাবী উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিতে পারে না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সীতানাথ নস্থকে কলিকাতায় পাঠাইতে মনঃস্থ করিলেন। কলিকাতায় তাঁহার এক আত্মীয় বাস করিতেন। তাঁহার নিকট রাখিয়া নস্থকে লেখাপড়া ও কাজকর্ম্ম শিখাইবেন স্থির করিলেন।

নিস্তারিণী ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিবার কারণও ছিল। ৫০ বৎসর আগেকার কলিকাতা আর এখনকার কলিকাতায় স্বর্গ-নরক প্রভেদ। তখনকার কলিকাতাকে পল্লীগ্রামবাসীরা একটা ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়া জানিত। বাস্তবিক ছিলও তাহাই; তৎকালীন কলিকাতার অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থান বঙ্গদেশে ছিল না বলিলেই হয়। এ হেন স্থানে বালক নস্থকে পাঠাইতে নিস্তারিণী সহজে স্বীকৃত হইল না, নস্থও পুরুতদা'কে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। সীতানাথ নিস্তারিণীকে অনেক বুঝাইয়া, নস্থকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া, শুভদিনে স্বয়ং তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিলেন। নিস্তারিণী কয়েকদিন অন্নজল ত্যাগ করিল, তারপর নস্থর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় বুক বাঁধিয়া মনকে স্থির করিল, এবং নস্থর মঙ্গলের জন্য দিনে সাতবার দামোদরজীর দ্বারে মাথা কুটিতে লাগিল।

নস্থকে কলিকাতায় রাখিয়া সীতানাথ ফিরিয়া আসিলে একদিন ভৈরববাবু তাঁহাকে বলিলেন, "কি ঠাকুর, খুব যে জল ঢাল্‌ছ।"

সীতানাথ উত্তর করিলেন, "আপনারাও তো আগুন জ্বালাতে কসুর করেন নাই।"

ভৈরব। কিন্তু এ পোড়া গাছে ফল ফলিবে কি ?

সীতা৽ ফলের আশাতেই লোকে কাজ করে, নিষ্ফলতার আশায় করে না।

ভৈরব। কিন্তু দেখো, শেষে যেন হাতের চেয়ে ফল বড় না হয়।

সীতানাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক; আমিও ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করি।"

(৩)

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল; শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর শীত, এমনই করিয়া দশটী শীত গ্রীষ্ম আসিল, আবার চলিয়া গেল। এই দশ বৎসরে সংসারের কত পরিবর্ত্তন হইল। তাহার সঙ্গে যে নস্যরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন না হইয়াছিল এমন নহে। সীতানাথের আত্মীয়টী দুইবৎসর কাল নস্যকে নিজের কাছে রাখিয়া তৎকাল-প্রচলিত ইংরাজী ও পারস্য ভাষায় কতকটা ব্যুৎপন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহার বন্ধু হরলাল বাবু কমিসেরিয়টে কাজ করিতেন; অতঃপর নস্য তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। হরলাল বাবু এই সুচতুর বালককে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তখন কমিসেরিয়টের কাজে যথেষ্ট পয়সা ছিল। সুতরাং আট বৎসর মধ্যে নস্য যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিল। নিস্তারিণীর দৈন্যাবস্থা ঘুচিল, মহেশ মিত্রের বন্ধক দেওয়া অনেক সম্পত্তি উদ্ধার পাইল, অনেক নূতন সম্পত্তি আসিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হইল। তাই বলিতেছিলাম, এই দশবৎসরে নস্যরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার নস্য নাম যদি নৃসিংহ বাবু রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতে দোষ কি?

দশ বৎসর পরে একখানি নৌকা আসিয়া গোপালনগরের প্রান্তবাহিনী ভদ্রার ঘাটে লাগিল। নৌকা হইতে নামিলেন নৃসিংহ বাবু, আর তাঁহার পশ্চাতে নামিল তক্‌মাওয়ালা চাপরাশী বা ভৃত্য। নৃসিংহ বাবুর আগমনে নির্জ্জীব মিত্রভবন আবার সজীব হইয়া উঠিল।

হিমবিশীর্ণ পাদপ বসন্তসমাগমে নবীন পুষ্পপল্লবে ভূষিত হইলে যেমন মধুমক্ষিকার দল তাহাকে বেষ্টন করিয়া অবিরাম গুন্ গুন্ স্বরে তাহার

সুখসৌভাগ্যের গুণগান করিতে আইসে, তদ্রূপ গ্রামের মক্ষিকাবৃত্তি অনেক ঘোষজা, বোসজা, চট্টরাজ আসিয়া নৃসিংহ বাবুর সুখ সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিল। যাঁহাদের কৃপায় নৃসিংহ বাবুর পিতৃদেব সমাজ-বহিষ্কৃত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে আসিয়া আপনাদিগকে নৃসিংহ বাবুর চিরশুভানুধ্যায়ী বলিয়া আলাপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। ইহাঁদের মধ্যে ভৈরব বাবুও একজন। তাঁহার-পুত্র যদুনাথ এক্ষণে নৃসিংহচন্দ্রের পরম বন্ধু হইয়া উঠিল।

দেখিয়া শুনিয়া সীতানাথ মনে মনে হাসিলেন, নৃসিংহচন্দ্রের জন্য একটু চিন্তিতও হইলেন। একদিন তিনি নৃসিংহকে বলিলেন, "ভায়া হে, 'বিষকুম্ভং পয়োমুখং' কেবল কবির কল্পনা নয়, সংসারে তা যথেষ্ট আছে।"

নৃসিংহ বলিলেন, "আছে বৈ কি ; উপস্থিত কোথায় দেখলেন ?"

সীতা। তোমারই কাছে।

নৃসিংহ। কে ? যদুনাথ বুঝি ?

সীতা। ঠিক ধরেছ। তা ভায়া, এ কুম্ভটাকে একটু দূরে দূরে রাখ্‌বে।

নৃসিংহ। কেন তার দোষ কি ?

সীতা। দোষ অনেক ; ওর ভিতরটা বিষে ভরা। ঐ তোমার বাপের সঙ্গে দলাদলির মূল কারণ।

নৃসিংহ। লোকের চরিত্র সব সময়ে সমান থাকে না। আর সেই সত্য যুগের বিবাদের কথা ধরে থাক্‌লে সংসারে বাস করা চলে না।

সীতানাথ নিরুত্তর হইয়া প্রস্থান করিলেন। তারপর একদিন নিস্তারিণী বলিল, "হাঁরে নসু, তুই নাকি ও পাড়ার যদুর সঙ্গে খুব মিশেছিস ?"

নৃসিংহ। পুরুতদা বুঝি বলেছে?

নিস্তা। কেবল তিনি কেন? অনেকেই তো বলে।

নৃসিংহ। অনেকের চেয়ে আমি আমার ভালমন্দ বেশ বুঝি।

নিস্তা। তোর পুরুতদা'র চেয়েও?

নৃসিংহ। পুরুতদা'র ভীমরথী হয়েছে।

নিস্তারিণী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল।

অনেক ছেলের স্বভাব, তাহাকে যে কাজ করিতে বারণ করা যায়, সে আগে তাহাই করিয়া বসে; যাহা লইতে নাই, তাহাই পাইবার জন্য কাঁদিয়া-কাটিয়া পাড়া মাথায় করে। নৃসিংহচন্দ্রেরও স্বভাব অনেকটা সেইরূপ। যখন সকলেই তাহাকে যদুনাথের সহিত মিশিতে বারণ করিল, তখন সে আরও অধিক আগ্রহের সহিত যদুনাথের সঙ্গে মেলামেশা করিতে লাগিল। এমন কি, যদুনাথের আশ্রিতা বা অনুগৃহীতা শ্রীমতী চম্পকলতা ওরফে চাঁপার সহিত এক-আধটু আলাপ করিয়া আসিতেও কুণ্ঠিত হইল না। দেখিয়া শুনিয়া পাড়ার লোকেরা গা-টেপাটেপি করিল, আর সীতানাথ নারায়ণ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এখন হইতে সীতানাথ দামোদরের পূজাদি কার্য্যে পুত্র রামেশ্বরকেই পাঠাইতেন, নিজে আর বড় একটা যাইতেন না।

(৪)

সেদিন সন্ধ্যার পর রামেশ্বর দামোদরের আরতি শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন একখানা কালো মেঘ বিরাট বপু বিস্তার করিয়া সমগ্র আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। ঘন অন্ধকারে পথ ঘাট সমাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, গভীর গর্জ্জনে মেঘ ডাকিতেছিল, ঝড় উঠিবার উপক্রম হইতেছিল।

রামেশ্বর ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীপথ অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে চলিল;

কিন্তু অধিকদূর না যাইতেই প্রচণ্ড ঝটিকা-প্রবাহ পথের ধূলা উড়াইয়া, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া উন্মত্ত দানবের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিল; সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনাদে আকাশ পৃথিবী কম্পিত করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বিদ্যুতের তীব্রস্ফুরণে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। রামেশ্বর আশ্রয়ান্বেষণে চারিদিকে চাহিল; বিদ্যুতালোকে দেখিল, সম্মুখেই একখানি গৃহ। রামেশ্বর ছুটিয়া গিয়া তাহার দাবায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৃহদ্বার ভিতর দিক হইতে রুদ্ধ; দাবাও স্বল্প পরিসর। সুতরাং রামেশ্বর সেখানে গিয়াও নিষ্কৃতি পাইল না; বৃষ্টির ছাট্ সবেগে আসিয়া তাহার অঙ্গে যেন বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। রামেশ্বর সিক্ত বস্ত্রে, কম্পিত কলেবরে দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

দরজায় একটু শব্দ হইল। ক্ষণপরেই দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ওখানে গা?"

কাঁপা কাঁপা স্বরে রামেশ্বর উত্তর দিল, "আমি রামেশ্বর।"

"ও কি, মারা গেলে যে, ভিতরে এস।"

রামেশ্বর ঘরে ঢুকিল। ঘর অন্ধকার; স্বরের অনুমানে রামেশ্বর বুঝিল, তাহার আহ্বানকর্ত্রী রমণী। রমণী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আলো জ্বালিল! সে আলোকে রামেশ্বর দেখিল, সর্ব্বনাশ! এ যে চাঁপা! সে যে চাঁপার ঘরে!

চাঁপা বলিল, "একটু ডাক্‌তে হয়, অন্ধকারে ভিজে গেছ যে! কাপড়খানা ছাড়।"

রামেশ্বর বলিল, "না।"

চাঁপা। ভিজে কাপড়ে থেকে শীতে কাঁপবে, তাও কি হয়? নাও কাপড় খানা ছেড়ে একটু ব'স। এতে আর তোমার জাত যাবে না।

কথার সঙ্গে সঙ্গে চাঁপার ওষ্ঠে একটু হাসি ফুটিল। সে একখানা

কাপড় লইয়া রামেশ্বরকে দিতে গেল। রামেশ্বর এদিকে ওদিকে চহিয়া ব্যস্তভাবে দ্বার খুলিয়া সেই ঝড় বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হইল। চাঁপা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্যধ্বনি ঝটিকার ভীম গর্জ্জনে বিলীন হইয়া গেল, তাহা রামেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল না।

পরদিন গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, রামেশ্বর চাঁপার ঘরে রাত্রিযাপন করিয়াছে। কথাটা যে কে প্রচার করিল তাহা জানা গেল না, তবে সকলেই এই ব্যাপার লইয়া একটা তুমুল সমালোচনা করিতে লাগিল। ভৈরব বাবু আসিয়া বলিলেন, "নৃসিংহচন্দ্র, তোমাকে ইহার একটা বিধান করিতেই হইবে। কেন না, তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব আমাদের সমাজের মাথা ছিলেন। বিশেষতঃ তোমারই পুরোহিতের এই কাণ্ড।"

নৃসিংহ বলিলেন, "পাপী হইলে পুরোহিত বলিয়া অব্যাহতি পাইবে না।"

তখন দুইদিন ধরিয়া নৃসিংহবাবুর বৈঠকখানায় সভাসমিতি বসিল; গ্রামের মাতব্বর লো রা আসিয়া সেই মহাসভা উজ্জ্বল করিতে লাগিল। অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গৃহীত হইল। নৃসিংহচন্দ্র গোপনে চাঁপার সাক্ষ্য লইলেন। চাঁপা তাঁহার কথার উত্তরে মৃদু হাসিল মাত্র। অবশেষে সেই সভা, সপুত্র সীতানাথ ভট্টাচার্য্যকে সমাজচ্যুত করিল। দামোদরের পূজার জন্য নূতন পুরোহিত নিযুক্ত হইল। নবীন পুরোহিত মহাশয় অশুচি-স্পর্শে পতিত দামোদরকে পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লইলেন। মানুষের পাপে দেবতাকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

নিস্তারিণী বলিল, "এ কি করলি নসু?"

নৃসিংহ। আমি তো আর পাঁচজনকে ছেড়ে থাকতে পারি না?

নিস্তা। কিন্তু যাকে ছাড়লি, সে তোদের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেছিল।

নৃসিংহ। তাতে তাঁর লাভের প্রত্যাশা ছিল।

নিস্তা। তোর বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

নিস্তারিণী ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের সান্নিধ্য ত্যাগ করিল।

সীতানাথ সকল শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কাহারও নিকট একটুও দুঃখপ্রকাশ করিলেন না, অথবা পৌরোহিত্যের দাবী করিবার জন্য নৃসিংহ বাবুর কাছে বা তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকটে কোন অনুরোধ করিতে গেলেন না। ব্রাহ্মণের এই অত্যধিক অহঙ্কার নিদর্শনে নৃসিংহ বাবু আরও চটিয়া গেলেন।

ভৈরব বাবু বলিলেন, "কি ঠাকুর, ফল যে হাত ছাড়িয়ে গেল?"

সীতানাথ পূর্ব্ববৎ সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "এখন কাঁচা কি না; পাক্‌লেই নরম হ'য়ে আবার হাতের ভিতর আস্‌বে।"

(৫)

একদিন প্রভাতে গ্রামের ভিতর ভয়ানক হৈ চৈ পড়িয়া গেল,—চাঁপাকে কে ছুরি মারিয়া খুন করিয়াছে। চৌকিদার ছুটিয়া পুলিসে সংবাদ দিল। তখন দারোগা, কনেষ্টবল, জমাদার আসিয়া অনুসন্ধানের ধুম লাগাইয়া দিল। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে গ্রাম তোলপাড় হইয়া উঠিল। গ্রামের অনেক মাতব্বর লোকেই সন্দেহ করিল যে, নৃসিংহ বাবুর দ্বারাই এই খুন হইয়াছে। তিনি ইদানীং প্রায়ই চাঁপার ঘরে যাওয়া আসা করিতেন।

তখন দারোগা সদলবলে নৃসিংহবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। অনুসন্ধানে তাঁহার বৈঠকখানা হইতে একখানা কাপড়

পাওয়া গেল, তাহাতে রক্তের দাগ। একখানা ছোরাও মিলিল। দারোগা নৃসিংহ বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন। আহারান্তে হত্যাকারীর চালান হইবে।

নিস্তারিণী ছুটিয়া গিয়া সীতানাথের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। সীতানাথ বলিলেন, "আমি গরীব বামুন, কি উপায় করিতে পারি মা ?"

নিস্তারিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি সব পার পুরুত কাকা ; একবার তুমি মিত্রবংশের মান বাঁচিয়েছিলে, এবার মান প্রাণ দুই বাঁচাও।"

সীতানাথ বসিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর, নেত্রদ্বয় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বেশ, তাই হোক, তুমি ঘরে যাও, আমি এর উপায় করব।"

নিস্তারিণী চলিয়া গেল। সীতানাথ পুত্রকে ডাকিয়া লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আহার ও দিবানিদ্রার অন্তে দারোগা বাবু আসামীকে চালান দিবার জন্য রিপোর্ট লিখিতেছিলেন, গ্রামের অনেক লোকই তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া বা বসিয়াছিল। এমন সময়ে সহসা রামেশ্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া একেবারে দারোগার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দারোগা কলম ফেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। রামেশ্বর বলিল, "দারোগা বাবু, আপনার ভুল হইয়াছে।"

দারোগা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "কে তুমি ? আমার ভুল ? কিসে ভুল হয়েছে ?"

রামেশ্বর সে বজ্রগম্ভীর স্বরে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "আমি রামেশ্বর; আপনি নির্দ্দোষীকে গ্রেপ্তার করেছেন।"

দারোগা। তবে দোষী কে তা তুমি জান ?

রামে। বেশ জানি।

দারোগা। কে দোষী?

রামে। দোষী আমি।

উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। দারোগা তীব্র দৃষ্টিতে এই নবোদ্গতশ্মশ্রু যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি চাঁপাকে খুন করেছ?"

রা। হাঁ।

দা। সাবধান যুবক, তুমি যা বলছ, তার পরিণাম কি জান?

রা। বেশ জানি। খুন করেছি, ফাঁসি যাব।

দা। কেন তুমি খুন কর্‌লে?

রা। সে সর্ব্বনাশী,—বিশ্বাসঘাতিনী।

তখন দারোগা পূর্ব্বের রিপোর্ট ফেলিয়া রাখিয়া অন্য কাগজ লইয়া রামেশ্বরের এজাহার লিখিতে লাগিলেন। রামেশ্বর যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এই, সে অনেকদিন হইতে চাঁপার সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আসক্ত; এজন্য তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে। গ্রামের সকলেই তাহার সাক্ষী। তথাপি সে চাঁপাকে ত্যাগ করে নাই। কিন্তু সেই চাঁপা ইদানীং অর্থলোভে নৃসিংহ বাবুর উপর আসক্ত হইয়াছিল। এবং তজ্জন্য সে রামেশ্বরকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। সেই জাতক্রোধে রামেশ্বর চাঁপাকে খুন করিয়াছে।

এজাহার শেষ হইলে রামেশ্বর কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা ছুরী বাহির করিয়া বলিল, "এই দেখুন, এই ছুরীতে আমি সে সর্ব্বনাশীকে হত্যা করেছি; এখনও ছুরিতে রক্তের দাগ আছে।"

রামেশ্বর দারোগার সম্মুখে ছুরি ফেলিয়া দিল। দারোগা দেখিলেন বাস্তবিকই তাহাতে রক্তের দাগ। তারপর গ্রামের দুই চারি জনের

এজাহার লইয়া জানিলেন যে সত্যই চাঁপার সহিত সংস্রব জন্য রামেশ্বর সমাজচ্যুত। তখন দারোগা নৃসিংহ বাবুর হাতের হাতকড়ি খুলিয়া লইয়া রামেশ্বরের হাতে পরাইয়া তাহাকে লাসের সহিত কোর্টে চালান দিলেন।

(৬)

যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রামেশ্বরের বিচার আরম্ভ হইল। যদু-নাথের পরামর্শে নৃসিংহবাবু তাহার পক্ষে একজন উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যদুনাথ বলিয়াছিল, "ভাই, বামুনের ছেলে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলে, তার জন্য একটা উকীল খাড়া করে দাও।"

নৃসিংহ বাবু উত্তর করিয়াছিলেন, "যে নিজমুখে খুন স্বীকার করেছে, তার উকীলে কি করবে?"

যদু। কিছু না করুক, তোমারও ত একটা সুনাম হবে।

মোকদ্দমার দিন গ্রামের অনেকেই আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল,—কেহ সাক্ষ্য দিবার জন্য, কেহ বা রামেশ্বরের পরিণাম দেখিবার জন্য। সীতানাথ এবং নৃসিংহ বাবুও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যদুনাথ ছিল না; সেদিন তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

বিচারে অধিক সময় নষ্ট হইল না। কারণ, আসামী নিজেই নিজের অপরাধের সকল প্রমাণ যোগাড় করিয়া দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিয়া রায় লিখিতে বসিলেন। সকলেই আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট রায় লিখিতে লিখিতে এক একবার আসামীর মুখের দিকে চাহিতেছিলেন। সে মুখ তেমনই প্রশান্ত, তেমনই সমুজ্জ্বল; তাহাতে ভীতি বা উদ্বেগের রেখামাত্র নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবিতেছিলেন, "কেন এ যুবক আত্মহত্যায় উদ্যত?"

আদালত-গৃহ নীরব, নিস্তব্ধ। সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া,

প্রহরীদের হাত ছাড়াইয়া, এক ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই হুজুর, রক্ষা করুন, বামুনের ছেলেকে রক্ষা করুন।"

প্রহরীরা তাহাকে দূরে অপসারিত করিবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া টানিল। সে আরও চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই হুজুরের, মহারাণীর দোহাই, ও বামুনের ছেলে নির্দ্দোষ, ওকে ফাঁসি দেবেন না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কে তুমি? কি বল্‌ছ?"

আগন্তুক উত্তর করিল, "আমি যদুনাথ ঘোষ, চাঁপার হত্যাকারী। রামেশ্বরকে ছেড়ে দিন, ও বামুনের ছেলে নির্দ্দোষ।"

ম্যাজি। যদি নির্দ্দোষ, তবে নিজ-মুখে দোষ স্বীকার করেছে কেন?

যদু। নৃসিংহ বাবুকে বাঁচাবার জন্য।

নৃসিংহ বাবু চমকিয়া উঠিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তোমার কথা বুঝতে পারলাম না।"

যদু। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি। চাঁপা অনেকদিন হ'তে আমার রক্ষিতা। রামেশ্বরের সঙ্গে তার যে সংস্রব রটনা হয়, সেটা মিথ্যা—গ্রামের লোকের চক্রান্ত, আর আমিই সেই চক্রান্তকারীদের মধ্যে প্রধান। তারপর ইদানীং আমি আমার বন্ধু নৃসিংহ বাবুকে নিয়ে মাঝে মাঝে চাঁপার ঘরে যেতাম। নৃসিংহ বাবু ধনবান্, সুতরাং চাঁপা ক্রমে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। আমার তা' সহ্য হতো না, এই বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে চাঁপার সঙ্গে আমার বচসা হ'ত। এখন হ'তে চাঁপা আমার অগোচরে নৃসিংহ বাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করে। আমি তা' জান্‌তে পেরে চাঁপাকে প্রহার করি, তাতে সে আমাকে ভয়ানক গালাগালি দেয়। আমি রাগ সাম্‌লাতে না পেরে তা'কে খুন করি। গ্রামের

অনেক লোকই আমার পিতার বাধ্য। তাদের ষড়যন্ত্রে পুলিস নৃসিংহ বাবুকে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করে। নৃসিংহ বাবুর মান প্রাণ বাঁচাবার জন্য রামেশ্বর নিজের ঘাড়ে সকল দোষ চাপিয়ে নিয়েছে। রামেশ্বর দোষ স্বীকার করায় প্রথমে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু শেষে সে আনন্দের উচ্ছ্বাস অনুতাপের তীব্র অগ্নিশিখায় পরিণত হ'লো। একে তো স্ত্রীহত্যা করেছি, তার উপর ব্রহ্মহত্যা করি কেন? যে ভয়ানক পাপ ক'রেছি তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি নিজে ধরা দিতে এসেছি।

মোকদ্দমার আরম্ভ হইতেই রামেশ্বরের অপরাধ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। রামেশ্বরকে দেখিয়া, তাহার নির্ভীক উত্তর শুনিয়া তাহাকে কিছুতেই অপরাধী বলা যায় না। কেবল তাহার স্বীকারোক্তিতে বাধ্য হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দায়রা সোপরদ্দ করিতেছিলেন। এক্ষণে পুনরায় সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া তিনি যদুনাথকে অভিযুক্ত করিলেন। রামেশ্বর মুক্তি পাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যুবক, কেন তুমি এরূপে আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছিলে?"

রামেশ্বর প্রফুল্লমুখে বলিল, "পিতার আদেশ।"

নৃসিংহ বাবুর ভ্রান্তি দূর হইল। তিনি সীতানাথের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "পুরুতদা', আমার জন্য আপনি পুত্রহত্যায় উদ্যত হ'য়েছিলেন?"

মৃদু হাসিয়া সীতানাথ বলিলেন, "তুমি ভুলে যাচ্চ, আমি যে তোমার পুরোহিত।"

নৃসিংহচন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু আমি তো আপনাকে ত্যাগ ক'রেছি!"

সীতানাথ। তুমি ত্যাগ করলেই ত্যাগ হ'লো না; আমি যে তোমার কুল-পুরোহিত!"

এক ঘ'রে

(১)

"আমায় দে মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করি !"

তখন শ্রাবণের মেঘ-মেদুর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ঝিম্ ঝিম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছিল, থাকিয়া থাকিয়া গুরুগম্ভীর রবে মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছিল। রাত্রি অধিক না হইলেও অন্ধকারাচ্ছন্ন কর্দ্দমিত পল্লীপথ নিস্তব্ধ হইয়াছিল; কেবল ডোবার পাশে কচুগাছের বন হইতে ঝিল্লীর বিরামবিহীন শব্দের সহিত ভেকের অশ্রান্ত চীৎকার উত্থিত হইয়া পল্লীর স্তব্ধ নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। এমনই সময়ে নিতাই আপনার ছোট ঘরখানিতে জানালার ধারে বসিয়া তাঁত বুনিতেছিল, আর মাকুর ঠক্ ঠক্ শব্দে তাল দিয়া আপন মনে অনুচ্চ স্বরে গাহিতেছিল,—

আমায় দে মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করি !

সহসা বাহির হইতে দরজায় ঘা পড়িল; কে ডাকিল, "নিতে দা, ও নিতে দা !"

চিরপরিচিত অথচ বহুদিনের অশ্রুত সেই ডাক শুনিয়া নিতায়ের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি তাঁত ছাড়িয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে, কানু ?"

উত্তর আসিল, "হাঁ।"

উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই নিতাই দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। কাহু ওরফে কাদম্বিনী ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল। তাহার পরণের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। নিতাই আন্‌লা হইতে আপনার একখান্ কাপড় পাড়িয়া দিয়া বাহিরে গেল। কাপড় ছাড়া হইলে সে ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি কাহু ? এই দুর্য্যোগে, এমন সময় ?"

কাহু একটু হাসিল ; বলিল, "কেন আস্‌তে কি নাই ?"

একটা মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিতাই বলিল, "খুব আস্‌বে। তবে এমন অসময়—"

বাধা দিয়া কাহু বলিল, "তোমার পক্ষে অসময়, কিন্তু আমার এই সময়।"

"সব ভাল তো ?"

"হ্যাঁ, আমি আজ এখানে থাকৃব।"

প্রদীপটা একটু উজ্জল করিয়া দিয়া নিতাই বলিল, "আমার সৌভাগ্য। কিন্তু হয়েছে কি শুন্‌তে পাই না ?"

কাহু গম্ভীর স্বরে বলিল, "সে সব শুনে তোমার কোন কাজ নাই। আমাকে আজ রাতটা এখানে থাকতে দাও, কাল সকালে উঠে চলে যাব।"

"কোথায় যাবে ?"

"চুলোয়।"

নিতাই তাহার স্বভাব জানিত ; সুতরাং সে এসম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া দাওয়া কি হবে ?"

কাহু বলিল, "কিছুই না। জলের কলসী কোথায় ?"

নিতাই কলসী দেখাইয়া দিল, কাহু নিজে জল গড়াইয়া খাইল।

নিতাই তাঁত বন্ধ করিয়া আপনার ভাত বাড়িতে গেল। তাহার খাওয়া হইলে কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শোবে কোথায় ?"

নিতাই বলিল, "আমি—আমি বাইরে রকে পড়ে থাক্‌ব।"

কাদম্বিনী ঘরে বিছানা পাতিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিল; নিতাই বাহিরে একখানা চেটাই পাতিয়া শুইয়া রহিল।

সেদিন নিতাই স্বপ্নে দেখিল, যেন তাহার সারা জীবনের সাধনা আজি পূর্ণ হইয়াছে, তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিতা দেববালা সহসা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, এবং মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া পারিজাতের মোহনমালা তাহার গলায় পরাইয়া দিতেছে।

(২)

সে আজ দশ বার বৎসর আগেকার কথা। তখন কাদম্বিনী এগার বছরের মেয়ে, আর নিতাই একুশ বৎসরের যুবক। তখন উভয়েরই জীবন-মুকুল সবে মাত্র প্রস্ফুটিত হইতেছে, উভয়েই জীবনের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া সংসারের বিচিত্র ঐন্দ্রজালিকতায় বিমুগ্ধ হইয়াছে। এই সময়ে—জীবনের এই পবিত্র উষায় হরিদাস দত্ত যখন কন্যা কাদম্বিনীকে নিতায়ের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, তখন উভয়েরই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের স্রোত বহিয়া গেল, তাহাদের বাল্যের সুখস্বপ্ন জীবনের প্রকৃত আনন্দ-স্বপ্নে পরিণত হইতে চলিল।

কিন্তু যাহা হইবার নহে, তাহা হইল না। অল্পদিন পূর্ব্বে কাদম্বিনীর মাতৃবিয়োগ হওয়ায় হরিদাস গৃহস্থালীতে গৃহিণীর অভাব অনুভব করিয়া কাদম্বিনীর এক বিধবা মাসীকে ঘরে আনিয়া রাখিয়াছিল। বিধবার স্বভাব চরিত্র মন্দ না হইলেও তখনও তাহার বয়স যায় নাই। সুতরাং পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলাবলি করিতে লাগিল। কিন্তু হরিদাস তাহাতে

টলিল না, সে একদিন এ বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পাড়ার দুই একজন মাতব্বরকে দুই চারি কথা শুনাইয়া দিল। ইহার ফলে হরিদাসকে শীঘ্রই সমাজচ্যুত—জাতিচ্যুত হইয়া এক ঘ'রে হইতে হইল।

কাদম্বিনীর বিবাহ বন্ধ হইয়া গেল। সমাজচ্যুত হরিদাসের মেয়েকে বিবাহ করিয়া নিতাই সমাজচ্যুত হইতে রাজি হইল না। নিতাই রাজি হইলেও তাহার পিতার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অমত ছিল। এমন কি, পিতার ভয়ে—সমাজচ্যুতির আশঙ্কায় নিতাইকে কাদম্বিনীদের বাড়ীতে যাতায়াত পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইল। কাদম্বিনী একদিন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে,কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নিতাই বলিল "মিথ্যা তা জানি, কিন্তু পাঁচ জনে তো সে কথা বুঝে না।"

কাদম্বিনী রাগিয়া বলিল, "তবে কি তোমার পাঁচ জনই বড় হ'ল?"

নিতাই উত্তর করিল, "সমাজে থাকতে হলে পাঁচ জনকে ছাড়া যায় না।"

রাগে কাদম্বিনীর কান্না আসিয়াছিল, কিন্তু অতি কষ্টে সে তাহা রোধ করিল। নিতাই শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অল্প দিনের মধ্যেই এক পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার সহিত নিতায়ের বিবাহ দিয়া নিতায়ের পিতা পরলোকে চলিয়া গেল।

কয়েক মাস পরে কাদম্বিনীর মাসী মারা গেল। হরিদাস সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া কিছু দণ্ড দিয়া বিবাদ মিটাইয়া ফেলিল। তারপর বিপত্নীক বৃদ্ধ মহাজন উদ্ধব দাসের নিকট চারিশত টাকা কন্যাপণ লইয়া তাহার হস্তে কাদম্বিনীকে সম্প্রদান করিল। নিমন্ত্রিত নিতাই বিবাহ স্থলে গিয়া উৎসবধ্বনির পরিবর্ত্তে চারিদিক্ হইতে কেবল নিয়তির অট্ট অট্ট হাস্য ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল।

তারপর দুই চারি বৎসরের মধ্যে অনেকগুলা পরিবর্ত্তন ঘটিল

হরিদাস দত্ত পরলোক যাত্রা করিল; পিতৃশোক বিস্মৃত না হইতেই কাদম্বিনী স্বামী হারাইয়া জন্মের মত শাঁখা শাড়ীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিল। নিতাইও পিতৃহীন হইল। তাহার পঞ্চমবর্ষীয়া পত্নী অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিয়া প্লীহার দুর্ব্বিষহ ভারে কালসাগরের অতল গর্ভে ডুবিয়া গেল। অনেকে নিতাইকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু নিতাই কাহারও অনুরোধ রাখিল না। সে আপন মনে তাঁত বুনিত, নিজে রাঁধিয়া খাইত, হাটে কাপড় বেচিয়া আসিত, আর মধ্যে মধ্যে স্তব্ধ নিশীথে একা বসিয়া বিশ্বেশ্বরীর নিকট 'তবিলদারী'র পদ প্রার্থনা করিত।

নিতায়ের আর একটা কাজ ছিল, মাঝে মাঝে কাদম্বিনীর তত্ত্ব লওয়া। তাহার বাড়ী হইতে কাদম্বিনীর শ্বশুরালয় এক পোয়ার বেশী দূর নহে, মাঝে কয়েক বিঘা জমি আর দুইটা বড় পুকুর মাত্র ব্যবধান। একটু অবকাশ পাইলেই নিতাই কাদুর খোঁজ লইতে যাইত।

(৩)

কাদম্বিনীর এখন বড় কষ্ট। উদ্ধবদাস মৃত্যুকালে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু কাদম্বিনী তাহা হাতে রাখিতে পারিল না। তাহার দেবর শ্রীদাম নানা ভীতি ও প্রলোভন প্রদর্শন দ্বারা কাদম্বিনীর টাকা গহনা সমস্ত হস্তগত করিল, তারপর তাহাকে সংসারের দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া দিল।

দাসীবৃত্তিতেও সুখ ছিল না। দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমের উপর দেবর ও দেবর-পত্নীর অবিশ্রান্ত বাক্যবাণগুলা কাদম্বিনীর মর্ম্মে অহরহঃ বিদ্ধ হইত। কাঁদিয়া তাহার দিন কাটিত, কতদিন তাহাকে অশ্রুসিক্ত মুখের গ্রাস ফেলিয়া উঠিয়া যাইতে হইত। কিন্তু হায়! তাহার এত

দুঃখ, এই কষ্ট দেখিবার বা বুঝিবার লোক ছিল না। যে ছিল, কাদম্বিনী স্বেচ্ছায় তাহার সহানুভূতি গ্রহণে বিরত হইল!

আগেই বলিয়াছি, নিতাই মধ্যে মধ্যে কাদম্বিনীকে দেখিতে আসিত। কাদম্বিনীর কষ্ট দেখিয়া একদিন নিতাই প্রস্তাব করিল "কাদু আমি তো পর নয়; আমার ঘরে যেতে আপত্তি আছে?"

মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া কাদম্বিনী উত্তর করিল, "একটু আছে।"

নিতাই। কি আপত্তি?

কাদম্বিনী। আমি এক ঘ'রের মেয়ে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিতাই বলিল, "এখনও আমার উপর তোমার রাগ যায় নি কাদু?"

কাদম্বিনী মুখ ফিরাইয়া কঠোর কণ্ঠে বলিল, "ম'লেও যাবে না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল, "তবে আর কি বল্‌ব। কিন্তু তোমার এই কষ্ট—"

বাধা দিয়া কাদম্বিনী বলিল, "আমার কোন কষ্টই নাই। তোমার কথা শুন্‌লে বরং আমার কষ্ট হয়। তুমি আর এসো না।"

সেই দিন হইতে নিতাই আর আসিত না।

নির্য্যাতন ক্রমে যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন কাদম্বিনী একদিন মরিবার সঙ্কল্প করিয়া, সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বাড়ীর বাহির হইল।

কাদম্বিনী ভাবিয়াছিল সে মরিবে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মরা যায় না। অহরহঃ যন্ত্রণাপীড়িত চির-দুঃখী স্থবিরও এই সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী বসুন্ধরা ত্যাগ করিয়া সহজে একটা অজানিত দেশে যাইতে চাহে না। তাই দুঃখভার-প্রপীড়িতা নির্য্যাতিতা কাদম্বিনী মরিতে আসিয়াও মরিতে পারিল না।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা; অন্ধকারে দিগন্ত আবৃত হইয়াছিল, গুড়্

গুড় শব্দে মেঘ ডাকিতেছিল, ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়িতেছিল। এমন সময়ে কাদম্বিনী পুকুর ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, এই অন্ধকারে, এই দুর্য্যোগে সে কোথায় যাইবে? ঘরে ফিরিবার আর উপায় নাই, ফিরিলে দ্বিগুণ অপমান, দ্বিগুণ নির্য্যাতন। তবে এখন কোথায় যাইবে? কে তাহার মত নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দিবে?

মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায় সহসা নিতায়ের কথা তাহার মনে পড়িল; তাহার অকৃত্রিম ভালবাসা, করুণ সহানুভূতি, প্রেমপূর্ণ আহ্বান সকলই স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল। সে আর কিছু না ভাবিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে রুদ্ধশ্বাসে নিতায়ের গৃহের দিকে ছুটিল।

যাহাকে চিরদিন ডাকিয়া আসিতেছি, সে আজ স্বয়ং গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান। নিতাই সানন্দে কাদম্বিনীকে আশ্রয় দিল। তাহার এরূপ অসময়ে আগমনের কারণ বুঝিতে পারিলেও তাহা কাদম্বিনীর মুখে শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

(৪)

প্রভাতে উঠিয়া নিতাই কাপড়ের একটা পুটুলি বাঁধিল এবং কাদম্বিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঘরে চাল ডাল সব আছে, রেঁধে বেড়ে খেও। আমি হাটে চল্লাম।"

কাদম্বিনী কোন উত্তর দিল না; নিতাইও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে নিতাই যখন ঘর্ম্মাক্ত দেহে হাট হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন কাদম্বিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত বেলা

নিতাই কলিকায় তামাকু ভরিতে ভরিতে বলিল, "হাট ব'লে রোজই এই রকম বেলা যায়।"

কাদম্বিনা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া দাওয়া কি হলো?"

শুষ্কমুখে ঈষৎ হাসিয়া নিতাই উত্তর করিল, "এখনও কিছু হয় নি; এবার হবে।"

কাদম্বিনী নারীজন-সুলভ কোমলকণ্ঠে বলিল, "তামাক রাখ; নেয়ে এসে ভাত খাও। বেলা কি আর আছে?"

হুঁকার ছিদ্র হইতে মুখ না সরাইয়াই নিতাই একটু হাসিল। এমন অনুরোধটা তাহার কাণে যেন সম্পূর্ণ নূতন ঠেকিল।

তারপর নিতাই স্নান সারিয়া আসিয়া যখন দেখিল, কাদম্বিনী ভাত বাড়িয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন হাসির পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতে তাহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

আহারে বসিয়া নিতাই চিরপরিচিত অন্নব্যঞ্জনের মধ্যে আজ যেন একটা নূতনত্বের স্বাদ পাইল। সে খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে কাদু?"

কাদম্বিনী বলিল, "কি ক'রে হবে? তুমি এই আসবে এই আসবে ভেবে ব'সে আছি, তোমার আর দেখা নাই।"

নিতাই তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া উঠিল, এবং মুখ হাত ধুইয়া তামাক সাজিতে বসিল। কাদম্বিনা নিজের ভাত বাড়িতে বাড়িতে তাহাকে ডাকিয়া ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে বলিল, "দেখ, তুমি বড় নোংরা; ঘরদোরগুলা যেন কি ক'রে রেখেছিলে। অমন যেখানে সেখানে তামাকের ছাই ঢেল না; কাপড় চোপড়গুলা ঐখানে গুছিয়ে রাখবে; ঘটী বাটী গুলায় কি ক'রে খেতে? উঠানে এত ঘাস কেন?"

নিতাই নিরুত্তরে হুঁকা হাতে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। সদয়-দাস আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, আজ হাটে কেমন লাভ হ'লো?"

নিতাই তাহার হাতে হুঁকাটা দিয়া সগর্ব্বহাস্যে বলিল, "খুব; এমন একদিনও হয় নি।"

(৫)

এক দিকে লাভ খুঁজিতে গেলে অন্যদিকে লোকসান সহ্য করিতে হয়, ইহাই সংসারের নিয়ম। সুতরাং নিতায়ের একদিকে যেমন যথেষ্ট লাভ হইল, অন্যদিকে তেমনই যথেষ্ট লোকসানেরও সূত্রপাত হইল। এই লোকসানের মূলে ছিল শ্রীদাম দাস। বিনা বেতনের দাসীটীকে হারাইয়া শ্রীদাম ও শ্রীদামের স্ত্রী যে যথেষ্ট লোকসান অনুভব করিতেছিল, ইহা বলাই বাহুল্য। এই ক্ষতির নিবারণকল্পে তাহারা অনেক চেষ্টা করিল। নিজে গিয়া, লোক লাগাইয়া তাহারা কাদম্বিনীকে অনেক যুক্তি পরামর্শ দিল, অনেক যত্ন আদর করিল, অনেক ভয় দেখাইল, কিন্তু কাদম্বিনী কিছুতেই টলিল না। তখন শ্রীদাম অগত্যা নিতায়ের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু নিতাইও অচল, অটল; সে কাদুকে তাহার নির্ভর আশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিতে সম্মত হইল না।

সর্ব্বথা নিরাশ হইয়া শ্রীদাম অবশেষে ইহার একটা প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিল। সে নিতাই ও কাদম্বিনীর নামে কতকগুলা কুৎসিত কথা রটনা করিল। সে কথায় কেহ সহজে বিশ্বাস না করিলেও কথাটা লইয়া পাঁচ জনে কাণাঘুষা করিতে লাগিল।

সে মৃদু আন্দোলনের তরঙ্গ নিতায়ের কাণে গিয়া ঠেকিল। কিন্তু নিতাই উহাকে ততটা গ্রাহ্য করিল না। কেন না তাহার ধারণা, সে নিষ্পাপ। মূর্খ নিতাই জানিত না যে, ঈশ্বরের বিধানে কেবল পাপের শাস্তি থাকিলেও মানুষের বিধানে অনেক সময় পুণ্যেরও শাস্তি হইয়া থাকে। জানিত না বলিয়াই নিতাই কথাটায় কাণ দিল না, কাদম্বিনীর কাণেও তুলিল না।

কাদম্বিনী বাহিরের কোন কথাতেই থাকিত না; সে শুধু নিতায়ের বিশৃঙ্খল গৃহস্থালীতে একটা শৃঙ্খলার মাধুর্য্য আনয়ন করিয়া, নিদাঘদগ্ধ

বনস্থলীতে বসন্তের স্নিগ্ধসুরভি শ্বাস বহাইয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল ; নিতাইও তাহার রাঁধা ভাত খাইয়া, তাঁত বোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিবর্ত্তনের মধুর উচ্ছ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া, আপনার লাভ লোকসানের হিসাব লইয়া ব্যস্ত রহিল। আর পাঁচ জনে—যাহাদের সহিত নিতায়ের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহারা নিতায়ের সুখে কিছুমাত্র সুখানুভব করে না, দুঃখে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে না, তাহারা নিতাই দাসের পরিণাম চিন্তায় বিব্রত হইয়া দীর্ঘ অলস দিনগুলা কাটাইয়া দিতে লাগিল।

(৬)

মানুষের প্রাণান্ত চেষ্টা প্রায়ই নিষ্ফল হয় না। শ্রীদামের আন্তরিক চেষ্টা ফলবতী হইল।

শ্রাবণের শেষে সদয় দাসের কন্যার বিবাহ। শ্রীদামের প্ররোচনায় পাঁচ জনে আপত্তি তুলিল, নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিলে কেহ তাহার বাড়ীতে পাত পাড়িবে না ; নিতাই ঘোর পাপী, ব্যভিচারী।

সদয় দাসকে পাঁচ জনের আপত্তি মানিতে হইল ; জ্ঞাতি হইলেও সে নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিল না।

কাদম্বিনী নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন হ'লো না ?"

ঈষৎ হাসিয়া নিতাই উত্তর করিল, "সব বাড়ীতে কি সকলের নেমন্তন্ন হয় ?"

কাদ। আর কারও না হ'ক তোমার তো হবে। তুমি যে জ্ঞাতি ?

নিতাই। সেই জন্যই তো নেমন্তন্ন হয় নি। আমি জ্ঞাতি শত্রু।

কাদ। আর কারও শত্রু না হও, তুমি আমার পরম শত্রু।

নিতাই ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে কাদম্বিনীর মুখের দিকে চাহিল।

কাদম্বিনী রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি আর আমার কাছে কিছু লুকাতে পারবে না।"

অপরাধীর ন্যায় ঈষৎ ভীতি বিজড়িত স্বরে নিতাই বলিল, "তোমার কাছে কি লুকিয়েছি কাদু?"

কাদ। তোমার নেমন্তন্ন বন্ধ, তুমি এক ঘ'রে।

মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে নিতাই বলিল, "তা' আমার পাঁচ ঘরে আর দরকার কি কাদু?"

কাদম্বিনীর মুখ আষাঢ়ী মেঘের ন্যায় গম্ভীর হইয়া উঠিল; উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আমি না বুঝে তোমার ঘরে এসেছি; তোমার অন্ন খেয়েছি ঝকমারী করেছি। তোমার মনে মনে এত?"

নিতাই স্থির ধীর স্বরে বলিল, "ছি কাদু, আমাকে অবিশ্বাস!"

কাদম্বিনী গর্জ্জন করিয়া উঠিল; বলিল, "সম্পূর্ণ অবিশ্বাস! তুমি চুপি চুপি আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ।"

নিতাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বাহিরে গভীরগর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া নিতাই বলিল, "ঠিক ব'লেছ কাদু, তোমার তা' হ'লে এখানে আর থাকা উচিত হয় না।"

কাদ। আমিও তাই ঠিক করেছি।

নিতাই। কিন্তু কোথায় যাবে?

কাদ। যমালয়ে।

একটু ভাবিয়া নিতাই বলিল, "আমার এক মাসী আছে, সেখানে যাবে?"

দৃঢ়স্বরে কাদম্বিনী বলিল, "না। আমি চল্‌লাম।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিতাই বলিল, "এই দুর্য্যোগে, এখনই?"

কাদ। এখনই; এই দণ্ডে।

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া কাদম্বিনী বাহির হইয়া পড়িল। তখন নৈশ অন্ধকারে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল, গড়্গড়্ শব্দে মেঘ ডাকিতেছিল, মেঘের উপর বিদ্যুৎ নাচিতেছিল, বৃষ্টির ঝর ঝর শব্দে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা গভীরতর হইতেছিল। এই অন্ধকার ও বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়া কাদম্বিনী যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে চলিল। নিতাই শুষ্কদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে একবার ডাকিল, "ফিরে এস কাদু, ফিরে এস।"

মেঘের গুরুগর্জ্জনে তাহার রুদ্ধ কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গেল। কাদম্বিনী ফিরিল না, একবার ফিরিয়া চাহিলও না। একটা বৃষ্টির ঝট্কা আসিয়া নিতায়ের আকুল দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া দিল।

তখন পাশের বিবাহবাড়ীতে ঘন ঘন শাঁখ বাজিতেছিল, হুলুধ্বনিতে উৎসবের আনন্দকল্লোল মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আর নিতাই অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহকুট্টিমে পড়িয়া আপনার আকুল হৃদয়ের ব্যর্থ প্রতিধ্বনি শুনিতেছিল,—ফিরে এস, ওগো ফিরে এস।

স্নেহের জয়

শ্রীমান্ বিনোদবিহারী যখন অকালে মাতা পিতা উভয়কেই হারাইয়া মাতুলের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন কে জানিত যে, এই ছয় মাসের অনাথ শিশুটী এক সময়ে সংসারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। কিন্তু লোকে যাহা ভাবে না, অনেক সময়ে তাহা অনায়াসেই ঘটিয়া যায়। মাতুল মথুরবাবু এই নিরাশ্রয় শিশুটীর ভার সযত্নে গ্রহণ করিলেন, মাতুলানী ক্ষেমঙ্করী তাহাকে আপনার শূন্য বুকের উপর তুলিয়া লইলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে একটি তিন মাসের শিশু তাঁহার বক্ষ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ক্ষেমঙ্করী বিনোদের মুখে আপনার স্তন্য প্রদান করিয়া সে শিশুর শোক কতকটা বিস্মৃত হইলেন।

এইরূপে পুত্রহীন দম্পতীর সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়া বিনোদবিহারী বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কলিকাতায় ভাড়াটে বাড়ীতে থাকিয়া ত্রিশ টাকায় সংসার চালানই ভার, কিন্তু মথুর বাবু তাহাতেই কষ্টে সংসার চালাইয়া বিনোদকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে বিনোদ এফ-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতে লাগিল। পড়ার খরচ চালাইবার জন্য ক্ষেমঙ্করী আপনার অঙ্গ হইতে এক একখানি অলঙ্কার খুলিয়া দিতে লাগিলেন। তারপর বিনোদ যখন বিএ দিয়া বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং মাতুলানীর পদতলে বসিয়া সে শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিল, তখন ক্ষেমঙ্করী বিনোদের মাথায় আপনার কেবল শাঁখা-পরা হাত দুইখানি বুলাইয়া,

তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তাঁহার নয়ননিঃসৃত আনন্দাশ্রুধারায় বিনোদের মস্তক সিক্ত হইতে লাগিল।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ্ রামহরি বাবুর কন্যা জ্ঞানদা দাসীর সহিত বিনোদের বিবাহ হইল, এবং শ্বশুরের পরামর্শক্রমে বিনোদবিহারী বর্দ্ধমানেই ওকালতি আরম্ভ করিলেন। শ্বশুরের চেষ্টায় অল্পদিনেই বিনোদের পশার জমিয়া উঠিল। তখন তিনি সেই স্থানেই আপনার স্থায়ী বাসভবন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। বর্দ্ধমানবাসী হইলেও কৃতজ্ঞ বিনোদবিহারী মাতুলাশ্রমকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন না, মাতুলের নিকট প্রতি মাসে মনিঅর্ডার যোগে পঞ্চমুদ্রা প্রেরিত হইতে লাগিল। প্রথম মাসের টাকা কয়টী হাতে পাইয়া ক্ষেমঙ্করীর আনন্দের ও গর্ব্বের সীমা রহিল না। সে কয়টী টাকা তিনি ঠাকুর দেবতার মানসিক শোধেই খরচ করিয়া ফেলিলেন।

মথুর বাবুকে কিন্তু এ মাসহারা অধিকদিন ভোগ করিতে হইল না; চিত্রগুপ্তের খাতায় পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশ দিবার জন্য শীঘ্রই তাঁহার ডাক পড়িল; তিনি অষ্টমবর্ষীয় পুত্র নবীনচন্দ্র এবং ক্ষেমঙ্করীকে ফেলিয়া সহসা একদিন ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। যাইবার সময় রোরুদ্যমান পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া গেলেন, "তোমাদের ভয় কি ? বিনোদ রহিল।"

বিনোদবিহারী এ সংবাদ পাইলেন। তিনি মাতুলের শ্রাদ্ধের জন্য দশ টাকা এবং মাতুলানী ও মাতুলপুত্রের বর্দ্ধমানে আসিবার রাহা খরচ তিন টাকা, মোট তের টাকা পাঠাইয়া দিলেন। ক্ষেমঙ্করী কোন প্রকারে স্বামীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুত্রের সহিত বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন, এবং বিনোদবাবুর বাটীতে সপুত্র আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

আইনজ্ঞ মুন্সেফের কন্যা জ্ঞানদা আইন-ব্যবসায়ী স্বামীর এতাদৃশ আইনবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রথম প্রথম বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকদিন

পরে যখন দেখিলেন, কেবল দুইটী লোকের খোরাক পোষাক দ্বারা সংসারের ঝি বামুনের খরচ বাঁচিয়া যাইতেছে, তখন তিনি স্বামীর সূক্ষ্ম আইনজ্ঞানের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

(২)

ক্ষেমঙ্করী এখানে আসিয়া যেমনটা দেখিবার আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার বিনু এক্ষণে বিনোদ বাবু। যে বিনোদ স্কুল হইতে আসিয়া বই ফেলিয়াই আগে মাতুলানীর নিকট ছুটিয়া যাইত, এত বড় হইয়াও সন্ধ্যার সময় একবার মামীমার কোলে মাথা দিয়া না শুইলে যাহার ঘুম হইত না, সেই বিনোদ এখন দেখা হইলেও মুখ তুলিয়া, ভাল করিয়া কথা কয় না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল করিয়া উত্তর দেয় না। বিনোদের হৃদয়ে যেন পূর্ব্ব স্মৃতির ছায়াটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। সে হৃদয় এক্ষণে জ্ঞানদার পূর্ণ অধিকারে। জ্ঞানদা মুন্সেফের কন্যা, উকীলের পত্নী। তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত; সে কি ক্ষেমঙ্করীর সহিত কথা কহিতে পারে? কিন্তু ক্ষেমঙ্করী দেখিতেন, তাহার ঐ সকল বহুমূল্য অলঙ্কারের মধ্য দিয়া তাঁহার নিজের বিক্রীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কারগুলি এখনও উকি দিতেছে।

ক্ষেমঙ্করী এ সকল দেখিয়াও দেখিলেন না, তাঁহার বিনোদ যে এতটা বড় মানুষ, এমন সুখী হইয়াছে, ইহাই তাঁহার যথেষ্ট আনন্দের বিষয়।

মাতুলানীর উপর পাকশালার ভার অর্পিত হইল। নবীনও অল্পদিনের মধ্যেই তামাক সাজায় বেশ সুদক্ষ হইয়া উঠিল, দোকান হইতে সামান্য সামান্য জিনিস-পত্রও আনিতে শিখিল। কিন্তু লোক-লজ্জা বলিয়া একটা ভয়ানক জিনিষ আছে; এই জিনিষটার ভয়ে অনেককে সময়ে সময়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করিতে হয়। বিনোদ-

বাবুকেও তাহাই করিতে হইল। তিনি নবীনকে এক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

কথাটা শুনিয়া জ্ঞানদা বলিলেন, "ভারি যে কুটুম্বিতা! আবার স্কুলে কেন?"

বিনোদ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভয় নাই, মাহিনা দিতে হবে না।"

জ্ঞা। বই টই সব চাই তো?

বি। সে আর কত?

সকালে গৃহস্থালীর এটা সেটা করিতেই নবীনের সময় কাটিয়া যাইত। তারপর স্কুল হইতে আসিয়া বিনোদের দুই বৎসরের মেয়ে সরমাকে লইয়া খেলিতে হইত। সন্ধ্যার পর ভাত খাইয়া নবীন, বিনোদবাবুর বৈঠকখানার একপাশে বসিয়া চুপি চুপি পড়া মুখস্থ করিত। মাঝে মাঝে আইন-অধ্যয়ন-নিরত বিনোদ বাবুর কলিকা পাল্টাইয়া দিতে হইত। চাকর তামাক সাজিয়া রাখিত, নবীন কেবল তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিত। পড়া শেষ করিয়া নবীন মাতার নিকট শুইতে যাইত, কোন দিন বা পড়িতে পড়িতে বৈঠকখানাতেই ঘুমাইয়া পড়িত। বাবু ভিতরে চলিয়া গেলে ভৃত্য শিউচরণ আসিয়া চুপি চুপি একটা বালিশ তাহার মাথায় দিয়া যাইত।

এ দিকে ক্ষেমঙ্করী প্রাণপণে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি ছিল না। মাঝে মাঝে তাঁহাকে দু'চার কথা শুনিতে হইত; তিনি নবীনকে বেশী মাছ দিয়াছেন, লুকাইয়া দুধ খাওইয়াছেন, রাত্রের জলখাবারের লুচি কি জন্য দুই খান্ কম হইল, ইত্যাদি দুই চারিটী খুচরা অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আসিত, এবং বিনোদের সমক্ষেই বধূ ঠাকুরাণী বেশ পাঁচ কথা শুনাইয়া দিত! বিনোদ

তাহাতে একটীও উত্তর দিতেন না। ক্ষেমঙ্করীও তাহার কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিতেন না, তিনি নীরবে সকল সহ্য করিতেন। কখনও তাঁহার একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ কেহ শুনিতে পাইত না। কাহার বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন? বিনোদ যে তাঁহারই স্তন্যদুগ্ধে লালিত, তাঁহার বক্ষই যে বিনোদের একমাত্র বিশ্রামের স্থান ছিল, এখনও যে বিনোদ তাঁহার বুকের ভিতর অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। সে স্থানটুকু এ পর্য্যন্ত নবীন অধিকার করিতে পারে নাই। সুতরাং তিনি কাহার উপর রাগ করিবেন? কাহাকে অভিশাপ দিবেন? কিন্তু যখন জ্ঞানদার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তাঁহার মর্ম্মের প্রত্যেক গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইত, তখন তিনি নিভৃতে সজলনেত্রে ঊর্দ্ধে চাহিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিয়া বলিতেন, "কোথায় তুমি দেবতা, স্বর্গে বসিয়া আশীর্ব্বাদ কর, আমার হৃদয়ে বল দাও; তোমার বড় স্নেহের বিনোদ! তার বিপক্ষে যেন আমার একটা নিশ্বাস, এক ফোঁটা চোখের জল না পড়ে!"

(৩)

প্রচুর অর্থাগমের সহিত যে দোষ স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, বিনোদ বাবুও সেই দোষের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। এক একটী করিয়া তাঁহার অনেকগুলি সঙ্গী জুটিল, তাহাদের উপদেশে চিন্তাক্লিষ্ট মনকে সুস্থ করিবার জন্য বিনোদবাবু একটু একটু 'পান' আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বেশ আসর জমিতে লাগিল, আর তথায় মদের এবং কর্জ্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ হইতে থাকিল। নবীনকে এই মাতাল দলের তামাক জোগাইতে হইত। সুতরাং নবীনের নির্য্যাতন দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে মন্দ মন্দ বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। একে শীতকাল, তাহার উপর, বৃষ্টি, সুতরাং সেদিন সপারিষদ বিনোদ বাবু

দেহটাকে গরম করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল, পারিষদগণ গৃহাভিমুখী হইতে উদ্যত হইল। বিনোদ বাবু ডাকিলেন, "ওরে নবে, আর একটা কল্‌কে দিয়ে যা।" কিন্তু কল্‌কে আসিল না। বিনোদ উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "নবে, ওরে নবে!"

ভৃত্য শিউচরণ আসিয়া বলিল, "তামাক দেব বাবু?"

বিনোদ বলিলেন, "হাঁ, নবে কোথায়?"

শিউ। ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি।

"ঘুমিয়ে পড়েছে!" গর্জ্জন করিয়া বিনোদ স্খলিত পদে অগ্রসর হইলেন। বালক বহিখানি পাশে রাখিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল, বিনোদ গিয়া তাহার পৃষ্ঠে সবলে চপেটাঘাত করিলেন। এক অব্যক্ত চীৎকার করিয়া নবীন ত্রস্তে উঠিয়া বসিল। বিনোদ তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিলেন, এবং তাহার গণ্ডদেশে আর এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "এত ঘুম কেন গো বাবু?"

একজন পারিষদ বলিয়া উঠিল, "দাদার ভাতে আছে, ঘুম হবে না?" নবীন ভীতিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "দাদা বাবু—"

"চুপ কর" কথার সঙ্গে সঙ্গে আবার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত। নবীন কাঁদিয়া উঠিল, এক হাতে চখের জল মুছিতে মুছিতে কাতরে বলিল, "আর মেরো না দাদাবাবু, আর আমি কখন ঘুমাব না।"

বিনোদ ভ্রূভঙ্গি করিয়া ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ, আজ তোর ঘুম ছাড়িয়ে দেব। গায়ের কাপড় জামা খোল।"

নবীন কাঁদিতে কাঁদিতে কাপড় জামা খুলিয়া ফেলিল, খুলিতে খুলিতে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দাদাবাবু, আর আমি ঘুমাব না।"

বিনোদ পুনরায় তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "না এই খালিগায়ে

বৈঠকখানার বাহিরে বসে থাক্। আমার বিনা হুকুমে উঠলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।”

কথার সঙ্গে সঙ্গে বালককে দ্বারের দিকে ঠেলিয়া দিলেন, নবীন সকাতর দৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিনোদ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নবীন কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া বাহিরের রোয়াকে বসিল। তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল, শন্ শন্ শব্দে উত্তুরে বাতাস বহিতেছিল। সেই বাতাস ও বৃষ্টির মধ্যে বালক নবীন নগ্নগাত্রে বসিয়া অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। বিনোদ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন, পারিষদবর্গও স্ব স্ব আশ্রয়ে প্রতি গমন করিল। কেবল নবীন একা অন্ধকারময়ী শীত রজনীতে বায়ু ও বৃষ্টির মধ্যে বসিয়া রহিল।

শিউচরণ আসিয়া বলিল, “দাদাবাবু, ভিতরে এস।”

নবীন কেবল বলিল, “না।”

অগত্যা শিউচরণ স্বীয় শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সকালে উঠিয়া শিউচরণ দেখিল, তখনও নবীন সেই একই ভাবে বসিয়া আছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে, সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। শিউচরণ কাছে গিয়া গা ঠেলিয়া নাড়া দিল। এ কি, গা দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে। শিউচরণ নবীনকে কোলে তুলিয়া লইয়া ক্ষেমঙ্করীর ঘরে দিয়া আসিল। ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করিলেন, “একি শিউচরণ?”

শিউচরণ বলিল, “কাল দাদাবাবু সমস্ত রাত বাইরে ব’সেছিলেন।”

ক্ষেম। কেন?

শিউ। বাবুর হুকুম।

ক্ষেমঙ্করী গিয়া পুত্রের পাশে বসিলেন; ডাকিলেন, "নবীন, বাবা!"

নবীন ঘূর্ণিত রক্তনেত্র উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া, আকুল আর্ত্তনাদে গৃহ-মধ্য কম্পিত করিয়া বলিল, "ও দাদা বাবু, আমি আর ঘুমাব না দাদা বাবু।"

ক্ষেমঙ্করী গিয়া জ্ঞানদার নিকট পুত্রের অসুখের কথা বলিলেন। জ্ঞানদা উত্তর করিল, "ও অমন হয়; অসুখ কি আর কারও হয় না?" অগত্যা ক্ষেমঙ্করী ফিরিয়া আসিলেন। মনে করিলেন, বিনোদকে বলি-বেন, কিন্তু বিনোদ তখনও ঘুমাইতেছে।

সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যার সময় অসুখ আরও বাড়িয়া উঠিল। ক্ষেমঙ্করী গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদকে বলিলেন, "বাবা বিনোদ, নবীন বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়ে যায়। তাকে বাঁচা বাবা।"

সন্ধ্যার পর ডাক্তার আসিল। রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার ভীত হইলেন, বলিয়া গেলেন, জ্বর ছাড়িবার সময়ে রোগীর প্রাণের আশঙ্কা আছে।

বিনোদ নিজে একবার নবীনকে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, নবীনের কিছুমাত্র চৈতন্য নাই; অজ্ঞান অবস্থায় নিজের চুল ধরিয়া টানিতেছে, বিছানার চাদর ছিঁড়িতেছে; শয্যার এদিকে ওদিকে ছট্‌ফট্‌ করিয়া ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে। আর মাঝে মাঝে আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "আমি আর কখন ঘুমাব না দাদাবাবু, আর ঘুমাব না।"

বুকের ভিতর সহসা যেন শত বৃশ্চিকে দংশন করিল; বিনোদ আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, ছুটিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন। জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌লে?"

বিনোদ। বোধ হয় বাঁচবে না।

জ্ঞানদা। তবে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে নাও। এত আপদও জুটে !

বিনোদ তীব্র দৃষ্টিতে একবার জ্ঞানদার দিকে চাহিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

শেষ রাত্রিতে জ্বর ছাড়িতে আরম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে নবীনের প্রাণ পাখী দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিল। ক্ষেমঙ্করীর চীৎকারে প্রভাতগগন কাঁপিয়া উঠিল। জ্ঞানদা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "মাগী চেঁচায় দেখ ; একটু ঘুমাবারও যো নাই।" বিনোদ কোন উত্তর দিলেন না, তখনও তাঁহার কাণে বাজিতেছিল, "আমি আর ঘুমাব না দাদাবাবু, আর ঘুমাব না।"

(৪)

নবীনের মৃত্যুর পরেও ক্ষেমঙ্করী কিছুদিন বিনোদের গৃহে রহিলেন। থাকিবার বড় ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কোথায় যাইবেন, কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে ? অগত্যা তাঁহাকে থাকিতে হইল। কিন্তু আর বুঝি থাকা যায় না। জ্ঞানদার বাক্যবাণ ক্রমেই তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার যো নাই, তাহার মধ্যে জ্ঞানদা গৃহস্থের ভাবী ঘোরতর অমঙ্গল দেখিতে পায় ; একটু শোক প্রকাশ করিতে গেলে বাড়ীশুদ্ধ সকলে জ্বালাতন হইয়া উঠে ; এক ফোঁটা চোখের জল পড়িলে জ্ঞানদা সুশাণিত বাক্যশরে তাঁহার শোকদীর্ণ হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়।

আর কেন ? ক্ষেমঙ্করী ভাবিলেন, আর কেন ? যাহার জন্য এতদিন তিনি অকাতরে সকল নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সে তো চলিয়া গিয়াছে তবে আর কেন ? আর এই পাপগৃহে থাকিয়া ফল কি ? বিনোদ ? বিনোদ তাঁহার কে ? বায়স-মাতার কোকিল-শাবক পালনের

ন্যায় তিনি বিনোদকে পালন করিয়া ছিলেন মাত্র, নতুবা বিনোদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? বিনোদ—অকৃতজ্ঞ পুত্রঘাতী বিনোদ, তাহার অন্ন পাপ-অন্ন; সে অন্ন খাইয়া আর কেন পাপভাগী হওয়া! তিনি বিনোদকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, কিন্তু কৈ বিনোদ তো এক দিনও মুখ তুলিয়া একটা কথা কয় না? নিদারুণ পুত্রশোকে একটাও তো সান্ত্বনার কথা বলিতে আসে না? তবে আর কেন? আর কেন স্নেহ! আর কেন মমতার বন্ধন!

ক্ষেমঙ্করী বিনোদের আশ্রয় ত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। পথে অনাহারে মরিতে হয় তাহাও ভাল, তথাপি আর বিনোদের গৃহে থাকিবেন না, তাহার পাপ-অন্ন মুখে তুলিবেন না।

সঙ্কল্প দৃঢ় হইলেও মায়ার বন্ধন ছেদন করা বড়ই কঠিন; তাই আজ কাল করিতে করিতে আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটিল, তাহাতে ক্ষেমঙ্করীর আর যাওয়া হইল না।

সহসা একদিন ক্ষেমঙ্করী শুনিলেন, বিনোদের ভয়ানক জ্বর হইয়াছে, এবং বসন্ত দেখা দিয়াছে। বসন্তের নামে বাড়ীর সকলেই ভয় পাইল। ডাক্তার বলিয়া গেলেন, কেবল শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন অন্য কেহ যেন রোগীর ঘরে না যায়; বসন্ত ভয়ানক সংক্রামক রোগ।

সকলেই ভয়ে ভয়ে রোগীর সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা পাইত। জ্ঞানদা সাধ্যসত্ত্বে সেদিকে যাইত না, কাহাকেও যাইতে দিত না। ইহাতে রোগীর শুশ্রূষার ত্রুটি হইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেমঙ্করী আর থাকিতে পারিলেন না; তিনি গিয়া বিনোদের রোগ-শয্যার পাশে বসিলেন, এবং আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগ দিন দিন প্রবলভাব ধারণ করিল, চিকিৎসক রোগীর জীবনের

আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ক্ষেমঙ্করী তাহা শুনিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, "হায়, মহাপাপিয়সী আমি, আমার অভিশাপেই বুঝি বিনোদের এই দশা, আমার দীর্ঘশ্বাসেই বুঝি বাছার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল! নবীনকে হারাইয়াছি, এবার বিনোদও বুঝি আমাকে ফাঁকি দেয়। ভগবান্, রক্ষা কর, আমার প্রাণ লইয়া বিনুর প্রাণ বাঁচাও!"

ক্ষেমঙ্করীর প্রার্থনা বিফল হইল না, বিনোদ ক্রমে আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিনোদের যখন চেতনা এবং কথা কহিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া ডাকিলেন, "জ্ঞানদা!"

ক্ষেমঙ্করী তাঁহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, "বাবা বিনোদ!"

বি। জ্ঞানদা কোথায়?

ক্ষে। বৌমা বাড়ীতেই আছেন।

বি। তাকে ডেকে দাও।

ক্ষে। তিনি এ ঘরে আস্‌বেন না।

বি। কেন?

ক্ষে। ডাক্তারে বারণ করেছে।

বি। বারণ করেছে?

ক্ষে। হাঁ বাবা, ছোঁয়াচে রোগ ব'লে—

বিনোদ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তবে তুমি এখানে এসেছ কেন?"

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন, "আমি আসব না? তোর চেয়ে কি আমার জীবনটা বড়?"

বিনোদ ভাল করিয়া ক্ষেমঙ্করীর মুখের দিকে চাহিল।

ক্ষে। আমাকে চিন্‌তে পারিস্ না বিনু ?

এ কোন্ স্বর্গের সম্বোধন! কতকাল পরে এ সম্বোধন বিনোদের কর্ণে প্রবেশ করিল! বিনোদ একটু থামিয়া, একটু ভাবিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "কে, মামীমা ?"

দেখিতে দেখিতে দুইবিন্দু অশ্রু বিনোদের পাণ্ডু কপোলদেশে গড়াইয়া পড়িল। ক্ষেমঙ্করী তাহা অঞ্চলে মুছাইয়া দিতে দিতে বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "ছিঃ বাবা, চুপ কর।"

বিনোদ তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া আকুল কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা! মা!"

মুহূর্ত্তে ক্ষেমঙ্করী সকল ব্যথা, সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, একটী মাত্র সম্বোধনে তাঁর কত দিনের দুঃখ, অভিমান, ক্লেশ, সব কোথায় ভাসিয়া গেল। আনন্দাশ্রুধারায় বিনোদের মস্তক সিক্ত করিতে করিতে তিনি তাহাকে আপনার বুকে টানিয়া লইলেন।

হায় মা! অপরাধী সন্তান আমরা; আমরাও কি এমনই করিয়া তোর ক্রোড়ে স্থান পাইব না ?

বারবেলা

(১)

বড়দিনের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হইবামাত্র যখন মেসের ছাত্রবৃন্দ রজনীতে এক বৃক্ষ-সমারূঢ় বিহঙ্গমগণের প্রাভাতিক ব্যাপারের ন্যায় স্বস্ব অভিলষিত দিকে প্রস্থান করিল, তখন এই মায়াময় সংসারের অসারতা বেশ স্পষ্ট আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। এমনি করিয়াই তো একদিন সকলকে এই নশ্বর সংসারের আত্মীয় স্বজনের মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দেশে চলিয়া যাইতে হইবে? হায়, আমার সংসার!

যাহা হউক, অভিনয়ান্তে অভিনেতৃপরিশূন্য রঙ্গমঞ্চসদৃশ এই নীরব ভবনে আমার আর তিলার্দ্ধ থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু কোথায় যাইব? বাড়ীতে যাইতে বড় একটা ইচ্ছা নাই। ইহার কারণ—"বুঝ লোক যে জান সন্ধান।" অবশেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, এই অসারে খলু সংসারে যাহা সার, সেই শ্বশুর মন্দিরে, গমনপূর্ব্বক শ্বশুর মহাশয়কে কৃতার্থ এবং তদীয়া তনয়ার মাসত্রয়ের বিরহানল নির্ব্বাপিত করিব।

বন্ধুবর শিরীশচন্দ্র তখনও মেসের খাটিয়ার মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে আমার এই শুভ সংকল্পটা খুলিয়া বলিলাম। বন্ধুবর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নিমন্ত্রণ এসেছে না কি?"

আমি তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম, নিমন্ত্রণ আসিলে তো আমি পুরাতন হইয়া গেলাম, তাহাতে আর নূতনত্ব কি? বিনা নিমন্ত্রণে সহসা উপস্থিত হইয়া সকলকে বিস্ময় ও আনন্দের অগাধ সলিলে নিমগ্ন করাই আমার উদ্দেশ্য।

বন্ধুবর আমার এই পরোপকার-প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "সাধু, সাধু!"

আমি মহোৎসাহে সাজগোজ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইলাম। বন্ধু বলিলেন, "আজই?"

আমি বলিলাম, "শুভস্য শীঘ্রং।"

বন্ধু। কিন্তু এখন যে বৃহস্পতিবারের ভরা বারবেলা?

হায়, ইংরাজ গুরুর শিষ্য হইয়াও বন্ধুবরের মনে এখনও জাতীয় কুসংস্কার বদ্ধমূল। আমি তাঁহার দিকে তিরস্কারসূচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "ছিঃ এখনও বারবেলা!"

বন্ধু আর কিছু বলিলেন না, আমি বাহির হইলাম। সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন, "দুর্গা, দুর্গা!"

আমার ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া গিয়া একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া বন্ধুবরের এই মজ্জাগত কুসংস্কার-জাল ছিন্ন করিয়া দিই। কিন্তু ৪টায় ট্রেণ। অগত্যা প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সাধু ইচ্ছাটাকে দমন করিয়া রাখিয়া আমি ট্রামে উঠিলাম।

এস্থলে বলা আবশ্যক, আমার শ্বশুর জীবনচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের নিবাস বৰ্দ্ধমান জেলার কোন এক গ্রামে। তিনি হুগলী জেলার ভবানীপুর মহকুমায় ওকালতী করেন। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে কর্ম্মস্থানই প্রায় বাসস্থানে পরিণত হয়। শ্বশুর মহাশয়ও এই নীতির অনুসরণে ভবানীপুরেই সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। আমি তাঁহার এই ভবানীপুরের

আবাস ভবনেই সম্মানিত অতিথিরূপে উপস্থিত হইবার জন্য যাত্রা করিলাম।

হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সনাতন প্রথানুসারে বেল বাজিল, সিগ্‌ন্যাল পড়িল, নিশান উড়িল, অমনই স্বদেশযাত্রী প্রবাসীর প্রাণমনোবিমোহন বংশীধ্বনি করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বিরাটকায় ট্রেণ ভবানীপুর অভিমুখে ছুটিল। আমি পকেট হইতে একটা স্বরচিত কবিতা বাহির করিয়া মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিতে লাগিলাম।

হে শ্বশুরভবনযাত্রী যুবকবৃন্দ! তোমরা যদি কখনও ট্রেনযোগে শ্বশুর-বাড়ী যাইতে ইচ্ছা কর, তবে মেল ট্রেণে যাইবার চেষ্টা করিও, কদাচ প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উঠিও না। হায়, এই হতভাগ্য ট্রেনখানা একটা ষ্টেশনও বাদ দেয় না, প্লাটফর্ম্ম নাই, খোলার চালের একটী ছোট কুঁড়ে, নির্ব্বোধ ট্রেণ সেখানে গিয়াও একবার করিয়া দাড়ায়। যে দুই মিনিট থামে, আমার বোধ হয় দুইটা ঘণ্টা বুঝি কাটিয়া গেল। তারপর যখন আপনার নির্দিষ্ট স্বাভাবিক গতিতে চলে, তখন মনে হয় আমি পায়ে হাটিয়া বুঝি ইহার অপেক্ষা অনেক দ্রুতগতিতে যাইতে পারি। রেল কোম্পানী এত করিয়াছেন, আর শ্বশুরমন্দিরযাত্রীদের জন্য একটা কোন উপায় করিতে পারেন না কি? তোমরা পারতো একটা বড় গোছের সভা করিয়া কোম্পানীর কাছে ইহার জন্য আবেদন করিও। আমার এখন আর বয়স নাই; থাকিলে তোমাদের আবেদন পত্রে একটা স্বাক্ষর করিতাম।

(২)

রাত্রি প্রায় ৭টার সময় ভবানীপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। শ্বশুর-বাসা এখান হইতে প্রায় একপোয়া পথ। পূর্ব্বে আর একবার মাত্র দুইদিনের জন্য এখানে আসিয়াছিলাম। পথঘাট বিশেষ পরিচিত নহে; তাহার

উপর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে নক্ষত্র ছিল, কিন্তু তাহা কোয়াশায় ঢাকা; রাস্তায় দূরে দূরে গ্রাম্য মিউনিসিপালিটীর কীর্ত্তিস্বরূপ এক একটি তেলের আলো জ্বলিতেছিল, কিন্তু আলোক-স্তম্ভের নীচে না গেলে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। যাহা হউক, ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বুক বাঁধিয়া বর্ত্তমান কষ্টটুকু সহ্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম, এবং ধূমাবৃত পল্লীপথে সাবধানে অগ্রসর হইলাম।

যাইতে যাইতে হাত দিয়াই (আয়না ব্রশের অভাবে) চুলগুলাকে একটু গুছাইয়া লইলাম। শালখানাকে যে ভাবে গায়ে দিলে বেশ মানায়, সে ভাবে রাখিতে পারিলাম না, কেন না শীতে সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল; অগত্যা আমার গতিশক্তিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য সেখানাকে সর্ব্বাঙ্গে জড়াইতে হইল। স্বেদোদ্গমের কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকিলেও রুমালে মুখখানা একবার মুছিয়া লইলাম।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীপথে বড় কষ্টেই একা অগ্রসর হইতেছিলাম, সহসা কল্পনা দেবী আসিয়া আমার সে কষ্ট দূর করিলেন। মুহূর্ত্তে আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল। তখন আমি সেই কুজ্ঝটিকারাশির ঘন যবনিকা ভেদ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে মর্ত্ত্যে অমরাবতীসদৃশ শ্বশুরভবন: ভবনের দ্বিতলস্থ একতম আলোক সমুজ্জ্বল কক্ষে (শীতকাল হইলেও) উন্মুক্ত গবাক্ষপার্শ্বে আমার নয়নানন্দবিধায়নী হেমলতা হেমগঠিতামূর্ত্তির ন্যায় উপবিষ্টা: তাহার ব্যগ্র দৃষ্টি পথের উপর নিক্ষিপ্ত। আলোকের উজ্জ্বল রশ্মি আসিয়া তাহার হৈম-গণ্ডে প্রতিফলিত হইয়াছে, দুই একগাছা চূর্ণ কুন্তল আসিয়া ক্ষুদ্র ললাটদেশে পড়িয়াছে, বাম করতলে বাম কপোল ন্যস্ত রহিয়াছে, যেন নব পল্লবরাশির উপর প্রফুল্ল কুসুমরাশি স্থাপিত হইয়াছে। এমনই ভাবে বসিয়া হেমলতা আকুল দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে নৈরাশ্যজনিত এক একটা দীর্ঘশ্বাসে সমুন্নত

বক্ষোবাস কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমি পথের উপর দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিরহিনীর এই বিরহ ব্যাকুলতা দেখিতে লাগিলাম; মনে মনে ভাবিলাম হায় আমি কি নিষ্ঠুর! প্রেমের এই সুকোমল লতিকাকে আমি বিরহানলে দগ্ধ করিতেছি!

আমি প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলাম, "হেম!"

জীমূতনাদ শ্রবণে তৃষিতা চাতকীর ন্যায় হেমলতা চমকিয়া উঠিল; চকিতে তাহার আকুল দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। মেঘনির্ম্মুক্ত রবিকর-স্পর্শে সমুজ্জল বাপী-হৃদয়ের ন্যায় তাহার চিন্তামলিন মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তে হাস্য প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে আমার দিকে চাহিয়া হর্ষগদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল; "তুমি এসেছ! এই দেখ, আমি তোমার জন্য বাসর সাজাইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিয়াছি; এমনি প্রত্যহই থাকি।"

"আর আমিও যে হেম, তোমাকে দেখিবার আশায় বন্ধুর নিষেধ না শুনিয়া, বারবেলা কালবেলা না মানিয়া তোমার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি।"

আনন্দের অত্যধিক আবেশে হেমলতার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল; তাহার সংজ্ঞাহীনা দেহলতা কক্ষতলে লুণ্ঠিত হইবার উপক্রম দেখিয়া আমি বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ছুটিলাম, কিন্তু রুদ্ধ দ্বারে আহত হইয়া পতনোন্মুখ হইলাম।

"কাণা নাকি হে?"—চমকিত হইয়া দেখিলাম, দ্বার নয়, বেশ মোটা সোটা একটা মানুষ। লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "মাপ করবেন মহাশয়, দৈবাৎ—"

সৌভাগ্যের বিষয় লোকটী উদ্ধত প্রকৃতির নয়। সে বলিল, "পথে দেখে চলতে হয়। তোমারই বা দোষ কি? যে কোয়াসা।"

সাহস পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশায়, জীবনবাবুর কোন্ বাড়ী ?"

"এই যে" বলিয়া লোকটা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সম্মুখের বাড়ী দেখাইয়া দিল ; অন্ধকার হইলেও আমি সে বাটী চিনিতে পারিলাম। একবার তৃষিত দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিলাম, কিন্তু কোন গবাক্ষ পক্ষ হইতেই একটুও আলোকরেখা বহির্গত হইয়া আমার কল্পিত স্বপ্নরাজ্যকে বাস্তবে পরিণত করিয়া দিল না। আপন মনে আপনিই হাসিয়া ভাবিলাম, এই নিদারুণ শীতের রাত্রিতে কল্পনা ব্যতীত কোন মানুষ কখন উন্মুক্ত গবাক্ষ-পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে পারে না।

আমি আশাস্পন্দিত বক্ষে অগ্রসর হইয়া দরজা ঠেলিলাম। বোধ হয় বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত, কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। তখন জোরে আরও জোরে দুই তিন বার দরজায় ধাক্কা দিলাম, সে শব্দ বহু দূরে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু বাড়ীর ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিল না। আবার ধাক্কা, আবার ধাক্কা। পাশের বাড়ীর দরজা খুলিয়া গেল। একটা চড়া গলায় প্রশ্ন হইল, "কে হে ওখানে দরজা ঠেলে ?"

আমি বলিলাম, "মশায়, জীবনবাবু—"

আমার কথায় বাধা দিয়া প্রশ্নকারী বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "হাঁ হাঁ, জীবনবাবু! তা অত দরজা ঠেলাঠেলি কেন ? দেখ্ছনা দরজায় চাবী ?"

চাবী! উপরদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সত্যই তো, একটা প্রকাণ্ড তালা মাথার উপর ঝুলিতেছে। অন্ধকারে এতক্ষণ এটাকে লক্ষ্য করি নাই। আমি তখন প্রশ্নকর্ত্তার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "জীবনবাবু কি এখন এ বাড়ীতে থাকেন না ?"

"এ বাড়ীতে থাক্‌বেন না তো কোথায় থাক্‌বেন ?"

"তবে—"

"তবে আবার কি ? তিনি ছুটীতে পুরী বেড়াতে গিয়েছেন।" মুহূর্ত্তে স্বপ্নরাজ্য অন্তর্হিত হইল; কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়ীতে কেউ নাই ?"

"বাড়ীতে লোক থাক্‌লে কি দরজায় চাবী বন্ধ থাকে ? কোথাকার পাগল তুমি ?"

আমাকে পাগল সিদ্ধান্ত করিয়া বক্তা মহাশয় সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। আমি হতবুদ্ধি হইয়া রুদ্ধদ্বার পার্শে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

একজন পথিক সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল; তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কলিকাতার গাড়ী কটায় ছাড়ে ?"

পথিক বলিল, "সকালে আটটায়।"

আমি। রাত্রে আর ট্রেন নাই ?

পথিক। ৭॥০ টায় শেষ ট্রেন চলে গেছে।

মুহূর্ত্তে সুখের স্বপ্ন বিপদের বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

শ্বশুর মহাশয় তো পুরী গিয়াছেন, এখন আমি যাই কোথায় ? কল্পনার মোহন রাজ্য কোথায় অন্তর্হিত হইল, এই নিদারুণ শীতে কোথায় একটু আশ্রয় পাই, রুদ্ধদ্বার পার্শে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ চিন্তার পর পাশের বাড়ীর যিনি ক্ষণকাল পূর্ব্বে আমাকে পাগল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারই বাটীর দ্বারে গিয়া দরজায় ঘা দিলাম। দুই চারিবার ঘা দেওয়ার পর দরজার পরিবর্ত্তে উপরের ঘরের একটা জানালা খুলিয়া গেল; পূর্ব্বকথিত বক্তা মহাশয় সেই জানালার পাশে দাড়াইয়া রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে ?"

আমি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে আমি জীবন বাবুর জামাই।"

বক্তা। জীবনবাবুর জামাই তা আমার কি? তোমার নাম?

আমি। শ্রীহরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বক্তা। নিবাস?

আমি। নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়; কলিকাতায় থাকি।

বক্তা। তা বেশ কর, আমার কাছে কি চাও?

আমি। আমি বড়ই বিপন্ন, "কোথায় আশ্রয় পাওয়া যায়" আমার কথা সমাপ্ত না হইতেই "বাজারে যাও" বলিয়া তিনি জানালা বন্ধ করিলেন।

আর একটা বাড়ী হইতে হারমোনিয়মের স্বরতরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের উচ্চ হাস্য-ধ্বনিতে সে তরঙ্গ ডুবিয়া যাইতেছিল। আমি সেখানে গিয়া সকাতরে আশ্রয় চাহিলাম। জনৈক প্রৌঢ় গা আড়া দিয়া উঠিয়া অর্দ্ধজড়িত কণ্ঠে বলিল, "কে বাবা এত রাত্রে? মালিনী মাসী নাকি?"

আমি বলিলাম, "মশায়—"

বাধা দিয়া প্রৌঢ় বলিল, "মশায় টশায় এখানে কেউ নাই বাবা, এটা পাঠশালা বাড়ী নয়। টান্‌তে পার?"

বক্তা বোতল ও গ্লাস উচু করিয়া তুলিয়া ধরিল।

আমি। মশায়, আমি ভদ্রলোক—

বক্তা। আর আমরাই বুঝি ছোট লোক? বেরো বেটা এখান হ'তে।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বেরো বেটা, বেরো।"

আমি ছুটিয়া পলাইলাম, মাতালের দল হাততালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আরও দুই এক বাড়ীতে আশ্রয় চাহিলাম, কিন্তু "বাজারে যাও"

ছাড়া আর কোন উত্তর পাইলাম না। অগত্যা অনেক খুঁজিয়া বাজারে উপস্থিত হইলাম।

বাজারে তখনও অনেক দোকান খোলা ছিল, কিন্তু থাকিলে কি হয়, কেহই আমাকে আশ্রয় দিতে চাহিল না। হায়, যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বলে—অতিথি-সৎকার পরম ধর্ম্ম, সেই হিন্দুর গৃহে আজ আমার ন্যায় বি এ পাশ সম্প্রাপ্ত অতিথি স্থান পাইল না? হিন্দু ধর্ম্মটার উপর আমার ভয়ানক রাগ হইল। কিন্তু যখন জনৈক দোকানদারের মুখে আমাকে আশ্রয় না দেওয়ার কারণ অবগত হইলাম, তখন আর সে রাগ রহিল না। শুনিলাম, কয়েক মাস হইতে বাজারে ভয়ানক চুরীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, পুলিস কিছুতেই চোর ধরিতে পারিতেছে না। এই ভয়ে কেহ অপরিচিতকে আশ্রয় দিতে সম্মত নহে। হায়, তবে কি পথে পথে ঘুরিয়াই আমাকে শীতের দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। বিনা নিমন্ত্রণে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া অননুভূতপূর্ব্ব সুখের পরিবর্ত্তে যে এমন একটা অচিন্তনীয় দুঃখের আস্বাদ অনুভব করিতে হইবে, প্রিয়তমার প্রেমালিঙ্গনের পরিবর্ত্তে শীতের দুঃসহ আলিঙ্গনে বদ্ধ হইতে হইবে, তাহা কে জানিত!

শ্বশুরের উপর ভয়ানক রাগ হইল। তিনি কি আর পুরী যাইবার সময় পাইলেন না? তার পর রাগ হইল হেমলতার উপর; হায়, তাহারই দর্শনাশায় আমাকে এরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় তো আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এরূপে চলিয়া যান নাই; আর আমি যে আসিব তাহা হেমলতাই বা কিরূপে জানিবে? দোষ সম্পূর্ণ আমার; অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করিলে তাহার ফল এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু আমি তো সর্ব্বজ্ঞ নহি।

কাহারও দোষ নাই, দোষ সেই দুষ্ট বারবেলার। মনসাদেবী যেরূপ স্বীয় দেবীত্ব প্রচারার্থ চাঁদ সদাগরকে বিপন্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপে বার-

ধরিয়া তুলিতে গেলাম ; কিন্তু তাহাকে তোলা হইল না, একটা কিচির মিচির শব্দে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল ; আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। অমনই দুইটা ইন্দুর আমার শয্যার উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। আমি ভয়ে ভয়ে বলিয়া উঠিলাম, দুর্গা, দুর্গা !

বিপদের সময় কুসংস্কার-সুসংস্কার জ্ঞান থাকে না।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আবার শুইলাম, কিন্তু আর ঘুম আসিল না, আমি পড়িয়া পড়িয়া মানুষের অবস্থা ও আশা সম্বন্ধে একটা গভীর গবেষণায় নিযুক্ত হইলাম। সে সময়ে লিখিবার উপকরণ কিছুই ছিল না, থাকিলে তাহা এমন একটা মৌলিক প্রবন্ধ হইত যে, মাসিক পত্রের পাঠকবর্গ তাহার রসাস্বাদনে অনন্ত জ্ঞানরত্নের অধিকারী হইতেন। মাসিকের দুর্ভাগ্য !

(৪)

"কড়্ কড়্ কড়্, কড়্ কড়্ কড়্" এ আবার কি উৎপাত ! শব্দটা ঠিক মাথার কাছেই দেয়ালের গায়ে হইতেছিল। বোধ হয় ইন্দুরে মাটী কাটিতেছে। কিন্তু ইন্দুরেরা কি মাটী কাটিবার সময় ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ করে ? আমি নিশ্বাস রোধ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, চোরে সিঁধ কাটিতেছে। এখন আমার কর্ত্তব্য কি ? কর্ত্তব্য চোর ধরা। কিন্তু দোকানের লোকদের যেরূপ নাসিকা গর্জ্জন শুনা যাইতেছে, তাহাতে উহারা সহজে জাগিবে বলিয়া বোধ হয় না। যখন জাগিবে, তখন যে চোর মহাশয় ধরা দিবার জন্য ঐ স্থানে অপেক্ষা করিবে না ইহা নিশ্চয়। আমার একটু সামর্থ্যের গর্ব্ব ছিল। সেই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভাবিলাম, আমি একাই চোর ধরিব ; যে দুর্ব্বৃত্তদের জন্য আমি আজ কোন স্থানেই আশ্রয় পাই নাই, সেই দুর্ব্বৃত্তদের নিজেই গ্রেপ্তার করিব

আমি উঠিলাম, কাপড় চোপড় আঁটিয়া পরিলাম, তারপর নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

যেখানে কর্ম্মচারী তিন জন ঘুমাইতেছিল, সেখানে আসিয়া একবার দাঁড়াইলাম, কিন্তু তাহাদের নিদ্রাভঙ্গের কোন লক্ষণই বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে হাতড়াইয়া দরজার কাছে গিয়া সবে মাত্র খিলটা খুলিয়াছি, এমন সময় পশ্চাৎ দিক্ হইতে দুই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল, এবং চোর চোর শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহাদের চীৎকারে অন্যান্য দোকানদারেরা জাগিয়া উঠিল। একজন কনেষ্টবল দুই জন চৌকীদার সঙ্গে "ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া" করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল, এবং যাহা একেবারেই অসম্ভব এরূপ কতকগুলি কুটুম্বিতা-সূচক সম্ভাষণে আমাকে সম্ভাষিত করিতে লাগিল। পিঠে যে দুই এক ঘা পড়িল না এমন নহে। আমি তো বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। একা অভিমন্যু সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়াও যুদ্ধে ভঙ্গ দেয় নাই সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় ত্রি-সপ্তরথি-পরিবেষ্টিত হইলে কি করিত বলা যায় না, বোধ হয় আমার ন্যায় নিশ্চেষ্টতা এবং নীরবতা অবলম্বনই শ্রেয় জ্ঞান করিত।

কনেষ্টবলের প্রশ্নের উত্তরে দোকানের কর্ম্মচারিদ্বয় এইরূপ বলিল, আমাকে আশ্রয় দিলেও তাহাদের বুদ্ধিমান্ মনিব মহাশয় নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, সকলকে সাবধানে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তদনুসারে তাহারা আমার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিল, শয়ন করিলেও তাহারা নিদ্রিত হয় নাই, অপ্রকৃত নাসিকা গর্জ্জনে নিদ্রার ভাণ করিয়াছিল মাত্র। তার পর আমাকে ছটফট করিতে দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হয়। পরে তাহারা বাহিরে মানুষের পায়ের শব্দ এবং ফিস্ ফিস্ পরামর্শ শুনিতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উঠিতে এবং দরজার দিকে যাইতে দেখিয়া।

তাহাদের স্থির বিশ্বাস হয় যে, আমি চোরের সঙ্গী। পরে অমি দরজা খুলিবামাত্র তাহারা আমাকে আক্রমণ করিয়া ধৃত করে।

বাহিরে আরও চোর আছে কি না দেখিবার জন্য কয়েকজন লোক আলো লইয়া দোকানের চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিল, কিন্তু সিঁধের গর্ত্ত ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

কনেষ্টবল আমার হাত বাঁধিয়া, আমাকে থানায় লইয়া গেল। দারোগা বাবু তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, সুতরাং জমাদারের অনুমতি ক্রমে আমি হাজত ঘরে নিক্ষিপ্ত হইলাম।

লোকে হাজত ঘর বা জেলখানাকে পরিহাস করিয়া 'শ্বশুরবাড়ী' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আজ আমার পক্ষে সেই পরিহাস এক-প্রকার সত্যে পরিণত হইল দেখিয়া এত দুঃখেও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রভাতে দারোগা বাবুর সম্মুখে নীত হইয়া আমি সকাতরে সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। আমার কথায় বোধ হয় তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি শ্বশুর মহাশয়ের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন। আমি সে দিন রাত্রি পুলিশের হাজতেই থাকিলাম।

পরদিন বেলা প্রায় ১০টার সময় হাজতে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, যদি শ্বশুর মহাশয় পুরীতে না থাকেন, তাহা হইলে আমার উদ্ধারের উপায় কি? আমি আসিবার পরদিনেই শিরীষের বাড়ী যাইবার কথা, সুতরাং সেসে টেলিগ্রাম করা বৃথা। কলিকাতার আর কোন পরিচিত ব্যক্তিকে টেলিগ্রাম করিব কি না? বসিয়া বসিয়া সাত পাঁচ ভাবিতেছি, সহসা হাজত ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। দারোগা বাবু শ্বশুর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন

বলা বাহুল্য, অমি তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাইলাম। শ্বশুর মহাশয় আমাকে

তাঁহার বাসায় যাইতে বলিয়া দারোগা বাবুর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভৃত্য নফর আমার সঙ্গে চলিল।

আমি বাসার দিকে না গিয়া ষ্টেশনের দিকে যাইতেছি দেখিয়া নফর বলিল, "ও দিকে নয় জামাই বাবু, এ দিকে।"

আমি বলিলাম, "তা জানি; ষ্টেশনে আমার একটু দরকার আছে, আগে সেরে আসি, তুই বাড়ীতে যা।"

নফর বাড়ী গেল না, আমার পাছু পাছু চলিল।

যখন ষ্টেশনে পৌছিলাম, তখন কলিকাতার গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া ছুটিয়া একখানা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নফর চীৎকার করিয়া ডাকিল, "জামাই বাবু, জামাই বাবু!" তাহার চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া বাষ্পীয়যান হুস্ হুস্ শব্দে আপন গন্তব্য পথে ছুটিল।

কলিকাতায় পৌছিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পরদিন শ্বশুর মহাশয় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আবার আমাকে ভবানীপুরে যাইতে হইয়াছিল, কিন্তু সে দিন আগে একখান পাঁজী কিনিয়া আনিয়া বারবেলা বাদ দিয়া তবে যাত্রা করিয়াছিলাম।

কালো বৌ

দাদা যে দিন বিবাহ করিয়া নব বধূর সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সে দিন পাড়ার মেয়ে মহলে একটা বিরাট সমালোচনার ধুম পড়িয়া গেল; বৌ দেখিয়া পাড়ার মেয়ে পুরুষ সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল। অনেক প্রাচীনা—যাঁহারা তিন কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল সংসারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, এই বয়সে তাঁহারা অনেক কালো কুৎসিত মেয়ে দেখিয়াছেন, কিন্তু এমনটী আর কখনও দেখেন নাই।

পাড়ার লোকের এইরূপ মতামত শ্রবণে এবং নব বধূর অদৃষ্টপূর্ব্ব মসীনিন্দিত বর্ণ দর্শনে আমার লজ্জা ও ঘৃণার সীমা রহিল না। আমি বুঝিতে পারিলাম না, বাবা দেখিয়া শুনিয়া নারী নামে পরিচিত এই কুৎসিত জীবটাকে কি জন্য বধূরূপে ঘরে আনিতে সম্মত হইলেন। শেষে একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, বাবা নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই এমন কাজটা করিয়াছেন। আমাদের বসত বাটীখানি আড়াই হাজার টাকায় বাঁধা পড়িয়াছিল; আর দুই তিন মাস টাকা দিতে না পারিলেই বাড়ী খানি মহাজনের অধিকারে যাইত, আমাদের সকলকে পথে দাঁড়াইতে হইত। কাজেই বাবা তিন হাজার নগদ মুদ্রার বিনিময়ে অক্ষয় বাবুর এই কন্যারত্নটীকে ঘরে আনিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কিন্তু টাকাটাই কি বড় হইল? তুচ্ছ বাড়ীখানার জন্য দাদার

জীবনের সুখ শান্তিটা এরূপে নষ্ট করা কি ভাল হইয়াছে? আমি ছেলে মানুষ, সংসারে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহা কিরূপে বুঝিব?

নব-বধূর পিতা অক্ষয় বাবু বড় লোক, হাইকোর্টের উকীল। কিন্তু বড়লোক হইলেই যে তাঁহার গৃহে সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, বিধাতা অবশ্য এমন কোন দলীলপত্র লিখিয়া দেন নাই। সুতরাং আমাদের ঘর আলো করিবার জন্য অক্ষয় বাবুর ঘরে এই কালো মেয়েটা জন্মিয়াছিল।

একবার মার সঙ্গে পল্লীগ্রামে মামার বাড়ী গিয়াছিলাম। সেখানে অমাবস্যার ঘনঘটাচ্ছন্ন নিশীথে যে বিরাট অন্ধকারের স্তূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম, আজি এই নববধূকে দেখিয়া সেই অন্ধকারের কথা মনে পড়িয়া গেল। ইহার উপর সেই কালো বৌটা—সেই অন্ধকারের উন্নত সংস্করণটা যখন আমাকে ঠাকুর পো বলিয়া ডাকিল, তখন রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে বড় লোকের মেয়ে হইতে পারে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে সোণা মুক্তার গহনাগুলা অমানিশার আকাশগাত্রে নক্ষত্রমালার ন্যায় দীপ্তি বিকাশ করিতে পারে, কিন্তু সে কিছুতেই আমাকে ঠাকুর পো বলিয়া সম্ভাষণ করিবার যোগ্য নয়। এই জন্যই তাহার সম্ভাষণের উত্তরে তাহাকে কালো বৌ বলিয়া ডাকিয়া তাহার উপর আমার অবজ্ঞার ভাবটা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলাম।

দেখিলাম, এই বিবাহে বাবা ছাড়া আর কেহই সুখী নহে। দাদা যে আন্তরিক দুঃখিত ইহা জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান দেখিয়া সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল।

(২)

বাবা এত করিয়া বাড়ীখানাকে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু কালের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া উহা ভোগ করিবার অবকাশ পাইলেন না। বিবাহের কয়েক মাস

পরেই তিন দিনের জ্বরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঐ অলক্ষুণে কালো বৌটাই যত সর্ব্বনাশের মূল।" আমিও মায়ের এই অনুমানের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম। দাদা অন্নচিন্তায় চমৎকৃত হইয়া বাবার আফিসের বড় বাবুর নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

অনেক হাঁটাহাঁটি কাঁদাকাটির পর দাদা পৈতৃক পদটী অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু বেতন দশ টাকা কমিয়া গেল। ইহারও মূলে যে ঐ অলক্ষণা কালো বৌটার সংস্রব আছে, ইহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব

বাবার মৃত্যুর পর আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে কালো বৌকে একবারও আনা হইল না। তাহার কথা উঠিলেই দাদা ঘৃণায় মুখ ফিরাইতেন। সুতরাং তাহাকে আনিবার আবশ্যক কি? কখন কোন হিতৈষিণী প্রতিবেশিনী তাহাকে আনাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে মা তর্জ্জন সহকারে বলিতেন, "সে অলক্ষুণে কাল পেঁচাকে আর বাড়ীর দরজা মাড়াতে দেব না। আমি এবার নিজে দেখে ছেলের আর একটা বিয়ে দেব।"

কালো বৌয়ের সংসর্গ অমনোনীত হইলেও দাদা কিন্তু পুনরায় দার-পরিগ্রহে অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু শেষে যখন মাতার ও কন্যাদায়গ্রস্ত রায় মহাশয়ের অনুরোধে নিজে গিয়া পাত্রী দেখিয়া আসিলেন; তখন আর সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। আমি মহোৎসাহে বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম।

দাদার বিবাহ হইয়া গেল। নূতন বোয়ের বাপ গরীব, তিনি একটী পয়সাও দিতে পারিলেন না। কিন্তু পয়সায় কি আসে যায়? পয়সা অনেক আসে, কিন্তু এমন সুন্দর বৌ সহজে মিলে না। এবার

বধূর রূপ দেখিয়া প্রতিবেশিনীরা শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিল, দাদার বিষাদ-কালিমাচ্ছন্ন মুখে আবার সুখের হাসি ফুটিল, আমাদের আঁধার ঘর আলো হইল। আর সেই অশেষ সৌন্দর্য্যশালিনী নব-বধূর মুখে সুকোমল "ঠাকুর পো" সম্ভাষণ শুনিয়া আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। কালো মেয়েটা জব্দ হওয়ায় আমার আনন্দের সীমা রহিল না।

কিন্তু সে কালো মেয়েটার অপরাধ কি? অপরাধ গুরুতর, সে সুন্দর নয়—কুৎসিত। অনন্ত সুন্দরের অংশ এই জগৎ,—এখানে কুৎসিতের স্থান নাই, সৌন্দর্য্যেরই একাধিপত্য। তাই অনন্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ বিশ্বরাজ্যে সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানব কুৎসিতের দিকে ফিরিয়া চায় না, কেবল সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়ায়, জগতে যাহা কিছু সুন্দর দেখে, তাহাতেই বিভোর হইয়া যায়, তাহাকেই আপনার করিয়া লইবার জন্য আকুলচিত্তে ছুটাছুটি করে; শেষে বিশ্বের সান্ত সৌন্দর্য্যে তৃপ্তি না পাইয়া অনন্ত সুন্দরের পায়ে লুটাইয়া পড়ে।

সৌন্দর্য্য আবার একটা নয়—দুইটা; একটার স্থান বাহিরে, আর একটা থাকে অন্তরে। বাহিরের সৌন্দর্য্যটা আপনার মাদকতায় দুই দিনের জন্য উন্মাদ করিয়া রাখে, আর অন্তঃসৌন্দর্য্য অনন্তকাল হৃদয়ে প্রীতির ধারা ঢালিয়া দেয়। উভয়ের সম্মিলনে মর্ত্তে অমরার দৃশ্য আবির্ভূত হয়।

কিন্তু তখন ছেলে বয়সে এতটা বুঝিতে পারি নাই, এখন সংসারের অনেক দেখিয়া শুনিয়া এটুকু বুঝিয়াছি।

নূতন বৌয়ের সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রথম প্রথম বেশ আনন্দ পাইয়াছিলাম, কিন্তু অল্পদিন পরেই সে আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। হায়! জগতে বাহ্য সৌন্দর্য্যের সহিত অন্তঃসৌন্দর্য্যের সমাবেশ কেন দেখা যায় না!

একটা সৌন্দর্য্যের সমুজ্জ্বল শিখা ঘরে আসিল এবং দাদা সে প্রদীপ্ত শিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সম্পূর্ণরূপে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা গৃহস্থালীর কোন অংশই উজ্জ্বল হইল না, তাহা সুগঠিত ভাস্করচিত্রের ন্যায় কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিদায়ক হইয়া রহিল।

(৩)

সে দিন স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম মার খুব জ্বর হইয়াছে। আমাদের আয় অল্প, সুতরাং বাড়ীতে বেশী দাসী চাকর বা পাচক পাচিকা ছিল না। মা একাই রন্ধনাদি করিতেন, একটী মাত্র ঝি গৃহ-কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিত। আজ মার অসুখ, সুতরাং রাত্রির আহারের কোন বন্দোবস্তই হয় নাই। অগত্যা আমি নূতন বোনের নিকট গিয়া বলিলাম, "বৌ দিদি, মার যে জ্বর?"

বৌদিদি তখন কেশবিন্যাসান্তে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখান শুভ্র তোয়ালের সাহায্যে মুখমার্জ্জন করিতেছিলেন। কর্কশ তোয়ালের কঠিন সংঘর্ষণে তাঁহার গৌরবর্ণ সুকোমল গণ্ডদ্বয় রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়া-ছিল, বোধ হইতেছিল, যেন আর একটু ঘর্ষণেই চর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্ত-ধারা ছুটিয়া বাহির হইবে। তথাপি বৌ দিদির বিরাম নাই। তিনি সেই একই ভাবে মুখ মুছিতে মুছিতে সংক্ষেপে আমার কথার উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

আমি বলিলাম, "এখন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার কি হবে?"

যেন একটু উপেক্ষার স্বরে নূতন বৌ বলিলেন, "সবার যা হয় আমারও তাই হবে।"

কথাটা শুনিয়া আমার একটু রাগ হইল; বলিলাম, "আমি শুধু তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, সকলের কথাই বলিতেছি।"

বাক্স হইতে টীপের কৌটা বাহির করিতে করিতে নূতন বৌ যেন রাগত ভাবে উত্তর করিলেন, "সকলের কথা সকলে জানে, আমার নিজের কথাই নিজে জানি।"

আমি দেখিলাম, এক্ষেত্রে কথা কাটাকাটি করিয়া কোন ফল নাই; তখন রাগের ভাবটা কমাইয়া সহজ কথায় বলিলাম, "যাই হোক, এখন রান্না বাড়ার যোগাড় করতে হবে তো ?"

নূতন। রাঁধবে কে ?

আমি। তুমি।

নূতন। সাত দিন সাত রাত উপোস করতে হলেও নয়। ওসব আমার সাত পুরুষে জানে না।

সামান্ত দরিদ্রকন্যার এই বৃথা গর্ব্বোক্তি শুনিয়া রাগে আমার সর্ব্ব-শরীর জ্বলিয়া উঠিল। মুখের উপর বেশ কড়া রকমের একটা উত্তর দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু দাদার রোষারক্ত নেত্র স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় অগত্যা সে ইচ্ছাকে দমন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

এখানে বলা আবশ্যক যে, ইদানীং নূতন বৌকে কিছু বলিলে দাদা তাহাকে সহজে ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

দাদা অফিস হইতে আসিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিলেন। দীনু ময়রার লুচী কচুরী সে রাত্রির মত আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল।

পরদিন সকালে মা উঠিয়া ভাত চড়াইলেন। আমি নিষেধ করিলাম, শুনিলেন না, বলিলেন, "যদি এক মুঠা ভাতে ভাতও ক'রে দিতে পারি, তবু তোদের কতকটা পেট ভরবে।"

মা ভাত চড়াইলেন বটে, কিন্তু আমাদের পেট ভরাইবার অবকাশ পাইলেন না, তাহার পূর্ব্বেই কম্প দিয়া জ্বর আসিল। ভাতের হাঁড়ি উনানে বসিয়া রহিল।

ক্রমে ভাত পুড়িয়া গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। ঝি গিয়া দুই তিন-বার নূতন বৌকে ডাকিল, কিন্তু তিনি আসিলেন না। শেষবারে শুনিতে পাইলাম, দাদা ঝিকে ধমক দিয়া বলিতেছেন, "মায়ের যেমন কাজ! জ্বর হ'য়েছে তো রাঁধতে যাওয়া কেন ?"

আমি ঝির বহু উপদেশ অনুসারে অনেক কষ্টে হাড়ীটাকে উনান হইতে নামাইয়া বাড়ীখানাকে বিকট দুর্গন্ধের হাত হইতে রক্ষা করিলাম।

সে দিন রাত্রিটাও দোকানের খাবারে কাটিয়া গেল। মার জ্বরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় পর দিন ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

(৪)

স্কুল হইতে ফিরিবার সময় দেখিলাম, আমাদের দরজা হইতে এক-খানা পাল্কী চলিয়া গেল। ভাবিলাম, হয় তো পিসীমা মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। আমি পড়িবার ঘরে বই খাতা রাখিয়া তাড়াতাড়ি পিসী-মাকে দেখিতে ছুটিলাম। কিন্তু মার ঘরের নিকট যাইতেই—একি দেখিলাম ? এ যে কালো বৌ! আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

আমাকে সে ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া এবং আমার মুখে চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, কালো বৌ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি ঠাকুর পো, ভয় পেলে না কি ? তবু দিনের বেলা।"

আমি কি উত্তর দিব খুঁজিয়া পাইলাম না। কালো বৌ বলিল, "কিন্তু ভয় নাই, আমি মানুষ।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাস্য। একি সুন্দর হাস্য! নূতন বোদের রাঙ্গা মুখের রাঙ্গা ঠোঁটে, লাল মেঘের কোলে বিজলীর ছটার ন্যায় হাসির ছটা দেখিয়াছি, কিন্তু সে হাসি তো এমন সুন্দর, এত মিষ্ট নয় ?

কালো মেয়ে কি এমন সুন্দর হাসি হাসিতে পারে ? সে হাসির এক একটা ছটা আসিয়া আমার অন্তরের অন্তরে বিদ্ধ হইতে লাগিল, মস্তক আপনা হইতে সেই কালো মেয়েটার পায়ের কাছে নত হইয়া পড়িল।

কালো বৌ হাসিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ করি, রাঙ্গা টুক্‌টুকে বৌ হোক।"

আমি লজ্জায় মুখ নামাইয়া বলিলাম, "আর টুক্‌টুকে বোয়ে বড় সাধ নাই। তুমি কখন্ এলে কালো বৌ —বৌ দিদি।"

কালো বৌ বলিল, "বৌ দিদি নয়, কালো বৌ তোমারই একটু আগে এসেছে।"

"তুমি কি মার অসুখের খবর শুনেছিলে ?"

"শুনেছি বৈ কি। তোমরা আমাকে একেবারে ভুলে গেলেও আমি তোমাদের ভুলতে পারি নাই, কাজেই খোঁজ খবরটা নিতে হয়।"

আবার সেই হাসি ! কালো বৌ কি না হাসিয়া থাকিতে পারে না ? তাহার এই সরল স্বভাবমধুর হাসি যে আমার বুকে অনুতাপের শেল বিদ্ধ করে তাহাও কি সে বুঝে না ? তা শেল বিদ্ধ করুক আর যাহাই হউক, সে হাসিটা কিন্তু বড় মিষ্ট, বড়ই প্রাণস্পর্শী। কৃষ্ণকাদম্বিনী-বক্ষে বিদ্যুতের উজ্জ্বল বিকাশ দেখিয়াছি, নীল সরসীহৃদয়ে রক্তপদ্মের মধুর আন্দোলন দেখিয়াছি, হরিৎপত্রান্তরালে গোলাপের মোহন হাসি লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু কালো মেয়ের কালো মুখে এমন মিষ্ট হাসি আর কখন দেখি নাই। কালো বৌ বলিল, "তোমাদের ঝির মুখে আমি প্রায়ই তোমাদের খবর পাই। কাল মার অসুখের খবর পেয়েছি। তাই আজ বাবাকে ব'লে ঝিকে সঙ্গে ক'রে দেখতে এলাম।"

কালো বৌ মার ঘরে ঢুকিল। আমি পড়িবার ঘরে গিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন "রোগ কঠিন, টাইফয়েড ফিভার।" শুনিয়া আমি ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম, ডাক্তার যে সকল ব্যবস্থার কথা বলিয়া গেলেন, তাহার এক বর্ণও আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না কিন্তু কালো বৌ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, "কি হবে কালো বৌ ?"

কালো বৌ বলিল, "ভয় কি, ডাক্তারে অমন বাড়িয়ে ব'লে থাকে। এখন এদিকে তোমাদের খাওয়া দাওয়ার কোন যোগাড় দেখ্‌ছি না। তোমরা খাও কি ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হাওয়া !"

কালো। তাতে পেট ভরে ?

আমি। যখন না ভরে, তখন দীনু ময়রার দোকানে যাই

কালো। সর্ব্বনাশ, রাঁধাবাড়া হয় না ?

আমি। রাঁধবে কে ?

কালো। কেন, বাড়ীতে কি আর লোক নাই ?

আমি। লোক আছে, কিন্তু রাঁধবার লোক কেউ নাই।

হাসিতে হাসিতে কালো বৌ বলিল, "তা এখন তো সে লোক এসেছে। ঝিকে উনানে আগুন দিতে বল "

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তুমি—তুমি রাঁধবে ?"

কালো। তাতে দোষ কি ? আমার হাতের রান্না বোধ হয় আমার মত কুৎসিত হবে না।

আমি লজ্জায় যেন মরিয়া গেলাম। কালো বৌ বলিতে লাগিল, "তা তোমরা না খেতে পার না খাবে, আমাকে তো খেতে হবে। আমি দোকানের ও জঞ্জালগুলা খেতে পারব না।"

আমি ঝিকে ডাকিয়া উনানে আগুন দিতে বলিলাম। এমন সময় কালো বোয়ের বাপের বাড়ীর ঝি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, পাল্কী এসেছে।"

কালো বৌ বলিল, "ফিরিয়ে নিয়ে যা। আমার এখন দু'চার দিন যাওয়া হবে না।"

ঝি চলিয়া গেল।

দাদা আফিস হইতে আসিয়া, মার ঘরে কালো বৌকে দেখিয়া বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কালো বৌ গলা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া বসিল। দাদা আমাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

কয়দিনের পর আজ ভাত খাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সে দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া ভাতগত-প্রাণ বাঙ্গালীর ভাতের উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তর বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করিয়াছিলাম, কিন্তু লক্ষপতির কন্যা যে কিরূপে এমন সুন্দর রাঁধিতে শিখিল, তাহার কারণ কোন বিজ্ঞানে বা মনস্তত্ত্বে খুঁজিয়া পাইলাম না।

(৫)

মার অসুখটা খুব সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। ডাক্তার বলিলেন, "এমন উপযুক্ত শুশ্রূষা না হইলে কেবল ঔষধে এরূপ রোগী বাঁচিতে পারে না।" বাস্তবিকই দেখিলাম, কালো বোয়ের প্রাণপণ শুশ্রূষাই এ যাত্রা মাকে কালের গ্রাস হইতে ফিরাইয়া আনিল। যে দিন হইতে রোগের বৃদ্ধি, সেই দিন হইতে কালো বৌ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিল, এবং একনিষ্ঠ যোগীর ন্যায় অনন্যমনে রোগীর পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যেও এক একবার উঠিয়া

আমাদের আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিত। এই সময়ে তাহার পরিশ্রম ও কার্য্যের শৃঙ্খলা দেখিলে মনে হইত, যেন সে আজন্ম কঠোর পরিশ্রম এবং সাংসারিক কার্য্যে রীতিমত অভ্যস্ত।

নূতন বৌ এ কয়দিন বড় একটা ঘরের বাহির হইতেন না। কেবল আহার্য্য প্রস্তুত হইলে অনেক ডাকাডাকির পর আসিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া যাইতেন, এবং সেই সময়ে অনুগ্রহ করিয়া কোন কোন দিন মার সংবাদ লইতেন। কালো বৌ স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইত, এবং হাসিয়া হাসিয়া নানা কথায় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইত। কিন্তু নূতন বৌ আলাপে বড় একটা রাজি ছিলেন না, তিনি সংক্ষেপে গম্ভীর ভাবে দুই একটা 'হাঁ' 'না' দ্বারা কালো বোয়ের আলাপের প্রাণান্ত চেষ্টাকে পরাভূত করিয়া দিতেন।

নূতন বোয়ের সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করিলেও কিন্তু কালো বৌকে একদিনও দাদার সম্মুখে বাহির হইতে দেখি নাই। দাদাকে দেখিলেই তাহার ঘোমটার বহর যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিত, লুকাইবার স্থানাভাব হইলে ঘরের দেয়ালের সঙ্গে যেন মিশিয়া যাই ইহাতে আমার বড়ই রাগ হইত। একদিন আর থাকিতে না পারিয়া বলিলাম, "কালো বৌ, এ তোমার বড় অন্যায়।"

কালো। কোন্‌টা অন্যায় ঠাকুর পো?

আমি। দাদাকে দেখলে এত লম্বা ঘোমটা টান কেন?

কালো। এ অমাবস্যা দেখলে পাছে কেউ ভয় পায়।

আমি। কৈ, আমি তো ভয় পাই না?

কালো। তুমি যে এখনও পূর্ণিমার আলো দেখ নাই।

আগেই বলিয়াছি, কালো বোয়ের বাপ খুব বড় লোক। তিনি কন্যাকে বিস্তর অলঙ্কার দিয়াছিলেন। একদিন দেখিলাম, কালো বৌ

নিজের সমস্ত অলঙ্কার নূতন বৌকে পরাইয়া দিয়াছে। আমি রাগিয়া বলিলাম, "একি কালো বৌ!"

ঈষৎ হাসিয়া কালো বৌ বলিল, "কেমন সেজেছে বল দেখি?"

আমি বলিলাম, "যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা।"

হাসিতে হাসিতে কালো বৌ বলিল, "কিন্তু আর একজন বল্‌বে, মণিকাঞ্চনের সংযোগ।"

কালো বৌ হাসিল বটে, কিন্তু সে হাসি চোখের জলে ভরা। আমার চক্ষুও জলে ভিজিয়া আসিল, আমি ছুটিয়া পলাইলাম।

মা বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কালো বৌ বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

(৬)

সে বৎসর কলিকাতায় বসন্তের খুব প্রাদুর্ভাব। দাদাও এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রোগ ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। নানা দুশ্চিন্তা ও কষ্টের মধ্য দিয়া দিন কাটিতে লাগিল। এই সময় নূতন বৌ একদিন তাহার পিত্রালয়ের নিকটবর্ত্তী জাগ্রত শীতলা দেবীর পূজা দিতে গেলেন; কিন্তু আর ফিরিলেন না। আমি আনিতে গেলে তাঁহার পিতা বলিলেন, "কি জান শরৎ বাবু, ও রোগটা বড়ই ছোঁয়াচে। বিশেষ, মনোর (নূতন বৌয়ের নাম মনোরমা) এখনও টীকা হয় নাই। সুতরাং ওর সেখানে থাকা উচিত নয়। তোমরা যেন কিছু মনে ক'রো না।"

আমি ফিরিয়া আসিয়া মাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "যা হ'বার হয়েছে, এখন কালো বৌকে খবর দেওয়া যাক্।"

মা বলিলেন, "সে মুখ কি আর আমাদের আছে।"

মুখ থাক আর নাই থাক, কালো বৌকে সংবাদ দিতে হইল। কেননা নূতন বৌ একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় আপনার অলঙ্কার পত্রের সহিত টাকা কড়ি যথাসর্ব্বস্ব লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এমন কি, দাদার চিকিৎসার পয়সাও রাখিয়া যান নাই। বলা বাহুল্য, দাদার সঞ্চয়-ভাণ্ডার আর নূতন বোয়ের সঞ্চয়ভাণ্ডার পৃথক্ ছিল না।

কালো বৌ সংবাদ পাইবা মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে দাদার রোগশয্যা অধিকার করিয়া বসিল। এখন আর তাহার লজ্জা নাই, আর তাহার মুখে ঘোমটা নাই। আমাদের আর্থিক অবস্থার কথা শুনিয়া নিজের হাত হইতে বালা জোড়া খুলিয়া দিল। তাহা বন্ধক রাখিয়া দাদার চিকিৎসা চালাইতে লাগিলাম। ক্রমে তাহার আরও দুই তিনখানি গহনা পোদ্দারের বাক্সে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

প্রায় এক মাস রোগ ভোগের পর দাদা অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। কালো বোয়ের মুখে আবার হাসি ফুটিল। কিন্তু হায়, তাহা কয়দিনের জন্য! সহসা আমাদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল।

একদিন রাত্রে কালো বোয়ের জ্বর হইল। দুই দিন পরে বসন্ত দেখা দিল। কালো বৌ শয্যাশায়ী হইল।

এসংবাদ পাইয়া অক্ষয় বাবু আসিলেন। তিনি কন্যাকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু কালো বৌ গেল না। পিতার প্রস্তাবের উত্তরে সে কেবলমাত্র বলিল, "আমার কি এখানে মরবারও অধিকার নাই বাবা?" অক্ষয় বাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, তিনি ভাল ভাল ডাক্তার কবিরাজ আনিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, যাহার কালের ডাক পড়িয়াছে, ঔষধে তাহার কি হইবে? কালো বোয়ের ব্যাধি সাংঘাতিক হইয়া উঠিল।

সে দিন রাত্রিতে রোগীর অবস্থা যেন একটু ভাল বোধ হইল। আমি জাগিয়া বসিয়াছিলাম; অক্ষয় বাবুর বাড়ীর ঝি এক পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। আমি ডাকিলাম "বৌ দিদি!"

রোগশীর্ণ অধরে একটু হাসির ক্ষীণ রেখা ছড়াইয়া ক্ষীণতর স্বরে কালো বৌ বলিল, "বৌদিদি কে? কালো বৌ বল ঠাকুর পো।"

আমি বলিলাম, "তুমি যদি কালো, তবে সুন্দর কে?"

কালো বৌ শুধু একটু হাসিল। একটু পরে বলিল "ওরা কেমন আছে ঠাকুর পো?"

আমি। ভাল আছে।

কালো। এখনও সেরকম ভুল বকে?

আমি। না, তবে ঘুম হ'তে উঠে জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, নূতন বৌ কোথায়?

দেখিলাম, কালো বোয়ের ম্লান মুখটা যেন আর একটু মলিন হইয়া গেল। একটু থামিয়া ডাকিল, "ঠাকুর পো!"

"বৌ-দিদি!"

"আবার বৌ-দিদি?"

"ক্ষমা কর বৌ-দিদি, আর আমি তোমায় কালো বৌ বল্‌তে পারবো না।"

"আমার কিন্তু ঐটাই বেশ মিষ্টি লাগে। যাক্, এখন আমার একটা শেষ কথা রাখ্‌বে?"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "কি কথা?"

কালো। ওকে জান্‌তে দিও না, কে ওর সেবা করেছে।

আমি। দাদা জানে সে নূতন বৌ।

কালো। তাই।

আমি। তোমার এ অনুরোধ কেন বৌদিদি ?

কালো। একজনের সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে ফল কি ?

আমি রাগতভাবে বলিলাম, "ফল—তোমাকে ত্যাগ করার প্রায়শ্চিত্ত।"

স্নিগ্ধ মধুরস্বরে কালো বৌ বলিল, "পাগল! বিবাহিতা স্ত্রীকে কি ত্যাগ করা যায় ? দশটা বিয়ে করলেও তিনি আমার স্বামী। আমি কায়মনে প্রার্থনা করি, তিনি সুখী হ'ন।"

আমি। আর তুমি কি চিরদিনই এমনি অনাদরে—

একটু হাসিয়া কালো বৌ বলিল, "দিন আর কোথায় ? আমার যে সময় হ'য়ে এসেছে।"

আমি আর চোখের জল রাখিতে পারিলাম না, উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ছেলে মানুষের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

সেই দিন শেষ রাত্রিতে কালো বোয়ের উপেক্ষিত ব্যথিত আত্মা শান্তিধামে চলিয়া গেল।

সে কতদিনের কথা। তাহার পর সংসারে কত দেখিয়াছি, কত ভুলিয়াছি, কিন্তু কালো বোয়ের মত আর কিছু দেখিলাম না; কালো বৌকে ভুলিতে পারিলাম না।

রাঁধুনী বামুন

রমানাথের বয়স যখন ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিল, তখন সে দার-পরিগ্রহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তানপুরার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল।

রমানাথের কুলগৌরব ছিল না, সে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তাহাদিগকে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত। সে পণের মাত্রাও নিতান্ত কম ছিল না। তাহার পিতা সাড়ে সাত শত টাকা কন্যাপণ দিয়া তাহার মাতাকে গৃহে আনিয়াছিলেন। তাহার খুল্লতাত সম্পর্কীয় এক জ্ঞাতি সর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়া এক চতুর্থবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরেই নয় শত টাকা মূল্যের বালিকাটী প্লীহাজ্বরে দেহত্যাগ করিল, আর বর মহাশয় ঋণের দায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ পূর্ব্বক বালিকা পত্নীর অনুগমন করিল।

সরস্বতীর সহিত রমানাথের পরিচয় নাই বলিলেও চলে, কমলারও তাহার উপর বড় একটা অনুগ্রহ ছিল না। সুতরাং কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ছয় শত রজতমুদ্রা হস্তগত না করিয়া তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিতে স্বীকৃত হইল না। কেবল কয়েক মাস পূর্ব্বে নলহাটীর রূপরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় সবিশেষ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই পাঁচশত উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র পণ লইয়া আপনার ছয় বৎসর বয়স্কা কন্যাকে রমানাথের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পণের টাকা ছাড়া সেই ছয় বৎসরের মেয়ের আড়াইশত টাকার গহনারও এক ফর্দ্দ ছিল। রমানাথ জমি জমা

বন্ধক দিয়া বহু কষ্টে পণের টাকাটার যোগাড় করিল, কিন্তু ফর্দ্দমত সকল গহনার যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিল না। কেহ কেহ পরামর্শ দিল, গহনার জন্য বড় একটা আটক রহিবে না। নির্দ্দিষ্ট দিবসে রমানাথ টোপর মাথায় দিয়া, দুই পাঁচজন বরযাত্র লইয়া বিবাহ করিতে গেল।

কিন্তু বিবাহ হইল না। পাত্রীর গর্ভধারিণী সোণার পাঁচনর ও রূপার গুজরী পঞ্চমের অভাব দেখিয়া মেয়েকে লইয়া ঘরে খিল দিলেন। রমানাথ অনেক সাধ্যসাধনা করিল, শেষে গহনার মূল্য স্বরূপ হ্যাণ্ডনোট পর্য্যন্ত লিখিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বুদ্ধিমান্ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উত্তর করিলেন "বাপু হে, কাল তুমি যখন আমার জামাতা হবে, তখন কি আমি হ্যাণ্ডনোট নিয়ে তোমার নামে নালিশ করতে যাব? লোকে যে আমার গায়ে ধূলো দেবে।"

অগত্যা রমানাথ সেই রাত্রেই বরযাত্রীদের সহিত বিষণ্ণচিত্তে ঘরে ফিরিতে বাধ্য হইল। লাভের মধ্যে খরচ খরচায় তাহার দুই বিঘা জমি হস্তান্তরিত হইয়া গেল। রমানাথ লজ্জায় কয়দিন বাড়ীর বাহির হইতে পারিল না।

সেই দিন হইতে রমানাথ বিবাহের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল, এবং একটা তানপুরা কিনিয়া গীতবাদ্য শিক্ষায় মনোনিবেশ করিল। বিষ্ণুপুরে ওস্তাদের অভাব নাই; রমানাথ একজন ওস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সা রে গা মা সাধিতে লাগিল।

রমানাথের সংসারে এক দূর সম্পর্কীয়া খুড়ী ছাড়া আর কেহ ছিল না। যে জমি জায়গা ছিল, তাহাতে কোন প্রকারে সংসার চলিয়া যাইত। সুতরাং রমানাথের সঙ্গীতচর্চ্চায় কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। সে দিনরাত তানপুরাটী কোলে লইয়া, তাহার সুগম্ভীর ধ্বনির সহিত আপনার গলা মিশাইয়া সা রে গা মা'র উচ্চতানে পল্লী

প্রতিধ্বনিত করিত। তাহাতে কি আনন্দ পাইত, তাহা রমানাথই জানে।

(২)

এইরূপে রমানাথ যখন বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা দ্বারা আপনার অবিবাহিত জীবনের দুঃখের বোঝাটার লাঘব করিতেছিল, তখন সহসা একদিন ভৈরব বাবু তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, ঘরে ব'সে ব'সে কি কর্‌ছ? চাকরী কর্‌বে?"

রমানাথ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "চাকরী! কোথায়?"

ভৈরব। কলিকাতায়; আমারই এক আলাপী লোকের বাড়ীতে। খুব বড় লোক, বিস্তর চাকর, নফর, দরোয়ান। খুব শক্ত কাজ নয়, সাত আট জনের রান্না; খাওয়া পরা পাবে, মাহিনেও বেশ মোটা।

রমানাথ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "আজ্ঞে চাকরী—চাকরী করতে বড় একটা ইচ্ছা নাই।"

"ইচ্ছা নাই?" ভৈরব বাবু বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা নাই? চাকরী করবে না তো এর পর খাবে কি?"

রমা। আজ্ঞে, একটা পেট বৈত নয়; তার জন্য আর পরের গোলামী কেন?

ভৈরব। চিরকালই কি একটা পেট থাক্‌বে? বিয়ে থা' করতে হ'বে;—বংশরক্ষা হওয়া চাই।

ঈষৎ হাসিয়া রমানাথ বলিল, "তার আর বড় একটা আশা নাই। সে অনেক গোলযোগ, বিস্তর টাকার ফের।"

ভৈরব বাবু ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "এ্যা, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। একি তোমার বিষ্ণুপুর, যে বিয়েতে টাকা লাগবে? এদেশেই তোমাদের বিয়েতে টাকা দিতে হয়, সে দেশে টাকা পাওয়া যায়।"

রমানাথ সবিস্ময়ে বলিল, "বলেন কি ?"

ভৈরব। আর বলি কি ? এ দেশে যেমন মেয়ের বাপকে টাকা দিতে হয়, সে দেশে তেমনি মেয়ের বাপ বরকে টাকা দিয়ে পায়ে ধরে মেয়ে দেয়, বুঝলে ?

রমানাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে তো বড় মজার দেশ !"

ভৈরব বাবু বলিলেন, "সেই জন্যই তো তোমায় যেতে বল্‌ছি। সেখানে গেলে কি তোমার বিয়ের ভাবনা থাক্‌বে ? তা' হ'লে কবে যাচ্ছ ?"

আশায় উৎফুল্ল হইয়া রমানাথ বলিল, "আপনি যে দিন বলেন।"

"শুভস্য শীঘ্রং, কাল সোমবার—দিক্‌শূল, পরশ্বই রওনা হও।"

রমানাথ খুড়ীর চলিবার বন্দোবস্ত করিয়া, তানপুরাটীকে কাপড়ে মুড়িয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়া, হৃষ্টচিত্তে কলিকাতা যাত্রা করিল।

(৩)

"তোর ঘর কোথায় রমা দা ?"

"অনেক দূর।"

"কত দূর ? ওপারে ?"

"গঙ্গার ওপারে বটে, তবে দু' তিন দিনের রাস্তা।"

"এতদূর ? ঘরে তোর কে আছে রমা দা ?"

"কেউ নাই।"

"কেউ নাই ? মা—বাপ ?"

"না।"

"ভাই—বোন ?"

"না বিনু, ভাই বোনও নাই।"

"কেউ নাই ; তবে তোকে কে ভালবাসে রমা দা ?"

রমানাথ একটু হাসিয়া, বালিকার ক্ষুদ্র চিবুকটী একবার নাড়িয়া দিয়া

বলিল, "ভালবাসার অভাব কি? আমাকে বিনু ভালবাসে, বিনুর মা ভালবাসে।"

বিনু ওরফে বিনোদিনী আপনার কোমল হাত দুইখানি দিয়া রমানাথের গলা জড়াইয়া ধরিল; তাহার মুখের নিকট মুখটী লইয়া গিয়া, ঘাড়টি একবার নাড়িয়া বলিল, "সত্যি রমা দা, আমি তোকে বড্ড ভালবাসি।"

রমানাথের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল; সে নীরবে বালিকার মুখের উপর হইতে ছোট ছোট চুলগুলি সরাইয়া দিতে লাগিল।

রমানাথের এই প্রথম বিদেশবাস। সে আর কখনও দেশ ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। যদিও দেশে তাহার আকর্ষণের বস্তু কিছু ছিল না, তথাপি জন্মভূমির একটা মমতা এই সুদূর প্রবাসে তাহার চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। দেশের সেই জঙ্গলাকীর্ণ অপরিষ্কৃত পথ ঘাট, সেই শৈবালদলপূর্ণ পুষ্করিণীর কৃষ্ণ সলিলরাশি, সেই তাহার ঘাটের ধারে বট গাছটী, সেই খড়ের চালের ছোট ঘরখানা, সেই পরিচিত কৃষকদিগের রৌদ্রতপ্ত অপরিচ্ছন্ন মুখমণ্ডল—যাহাদিগকে রমানাথ একদিনের জন্যও সুন্দর বলিয়া ভাবে নাই—তাহারাই আজ যে দূর হইতে এমন মোহন মূর্ত্তিতে রমানাথের সম্মুখে দাঁড়াইবে, এতটা অজ্ঞাত স্নেহের আকর্ষণে তাহাকে আকৃষ্ট করিবে, ইহা রমানাথ একদিনের জন্যও ভাবে নাই। এখন এই দূর প্রবাসে বসিয়া রমানাথ তাহাদের কথা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, সেই নিঃসঙ্গ প্রবাসে একটা স্নেহসঙ্গলাভের জন্য আকুল হইয়া পড়িল।

খিদিরপুরে উকিল ত্রৈলোক্য বাবুর বাড়ীতে রমানাথের চাকরী হইয়াছিল। খুব বড় বাড়ী, দাস দাসী লোকজনে বাড়ী ভরা। কিন্তু রমানাথের ক্ষুব্ধ হৃদয় সেখানে আপনার আকাঙ্ক্ষার বস্তু খুঁজিয়া পাইল

না। সেখানে ছিল কেবল টাকার ঝন্‌ঝনি, দাসদাসীদের বক্‌বকানি, আর কথায় কথায় কর্ত্তা গৃহিণীর চোখ রাঙানী। আর ছিল বিলাসের উদ্দাম নৃত্য, স্বার্থের অবাধ প্রভুত্ব, হৃদয়হীনতার একাধিপত্য। সেখানে রমানাথের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে কিরূপে ?

সেই বড় বাড়ীর পাশে একটী ছোট খোলার বাড়ী। উমেশচন্দ্র ঘোষাল নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই বাড়ীর মালিক। বাড়ীখানি যেমন ছোট, বাড়ীতে পরিজনও তেমনই অল্প ; – ঘোষাল মহাশয়, তাঁহার গৃহিণী, অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা বিনোদিনী, আর পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র সতীশ। ঘোষাল মহাশয় কলিকাতার কোন এক সাহেবের আফিসে কাজ করেন। যে বেতন পান, তাহাতে কায়ক্লেশে এই কয়টী প্রাণীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। রমানাথের অদৃষ্টসূত্র তাহাকে টানিয়া আনিয়া এই পরিবারের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিল।

অন্যান্য গুণের মধ্যে রমানাথের একটা গুণ ছিল, সে বড় মিশুক। সে পরিচিত অপরিচিত সকলের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতে পারিত ; আর একবার তাহার সঙ্গে যে মিশিত, সেই এমন একটা আকর্ষণে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইত যে, তাহা সহজে ছিন্ন হইত না। এই গুণের প্রভাবে রমানাথ, ঘোষাল মহাশয়ের, বিশেষতঃ তাহার কন্যা বিনুর সহিত অল্প দিনের মধ্যেই মিশিয়া গেল ; দেখিতে দেখিতে বাড়ীর সকলেই তাহাকে আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। রমানাথ যাহা খুঁজিতেছিল, এই ক্ষুদ্র দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তাহা যথেষ্ট পাইল, পাইয়া সে প্রবাসের নিদারুণ ক্লেশ বিস্মৃত হইল।

রমানাথ প্রত্যহ কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া আহারান্তে বিনুর কাছে আসিত। বিনুর ও সতীশের সহিত খেলা করিয়া গল্প বলিয়া মধ্যাহ্ন কাটাইয়া দিত। অপরাহ্নে কখন কখন বিনুকে লইয়া বেড়াইতে বাহির

হইত। বেড়াইতে গিয়া বিনু কখন খাবার, কখন খেলনা, কখন কাচের চুড়ি বা মাথার কাঁটা পাইত। পাইয়া বিনু যখন হাত নাড়িয়া, ঘাড় দোলাইয়া, মাথার ছোট ছোট চুলগুলিতে ঢেউ খেলাইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিত, তখন রমানাথ, বাবুর ধমক্, গৃহিণীর অকারণে প্রদত্ত অপবাদ সকলই ভুলিয়া গিয়া আপনার অর্থোপার্জ্জন সার্থক জ্ঞান করিত।

ক্রমে বিনুও রমাদার উপর এমন আসক্ত হইয়া পড়িল যে, রমা দা না হইলে তাহার একটা দিনও চলিত না। ত্রিশ বৎসরের যুবকের সহিত অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার প্রেমানুরাগ সম্ভবে না, সুতরাং আমরা এই ভাল-বাসাটাকে প্রেম বা প্রণয় নামে অভিহিত করিতে পারিলাম না।

সে দিন রবিবার বলিয়া রমানাথের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। বিনু যেন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, কেবল ঘর বাহির করিতেছিল, বার বার ব্যগ্র দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিতেছিল, আর এখনও কেন রমা দা আসিল না ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া মাতাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। কন্যার এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া গৃহিণী হাসিতে হাসিতে ঘোষাল মহাশয়কে বলিলেন, "বিনু যেমন রাতদিন রমা দা, রমা দা করে; তেমনই রমা দার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "মন্দ কি? আমিও তাই মনে ক'রে রেখেছি।"

বিনু মাতার উপর একটা কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া পলাইল। সহসা উৎফুল্ল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "রমা দা, রমা দা!"

রমানাথ সবে মাত্র বাহিরের দরজায় পা দিয়াছে, এমন সময়ে কর্ত্তা গৃহিণীর কথোপকথন, তাপদগ্ধ মরুবক্ষে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের কর্ণে জলদ-গর্জ্জনের ন্যায়, নিরাশাদগ্ধ জীবের শ্রুতিপথে আশার মোহন বংশীধ্বনির

ন্যায়, রমানাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন পথমধ্যে সহসা সমুজ্জ্বল আলোক দর্শনে পথিক যেরূপ ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিবিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তেমনই রমানাথ আশার অতীত কথা শুনিতে পাইয়া মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সে তো এক দিনের জন্যও এমন দুরাশাকে হৃদয়ে স্থান দেয় নাই? বিনু—বিনুর সহিত তাহার বিবাহ! রমানাথের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে আর অগ্রসর না হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। এমন সময় বিনু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল; "রমা দা, রমা দা!"

রমানাথ ছুটিয়া ত্রৈলোক্য বাবুর বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

সেই দিন হইতে রমানাথের চিতা সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী হইল, খাইতে শুইতে, বসিতে আশা আসিয়া তাহাকে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব কল্পনারাজ্যে লইয়া গিয়া ঘুরাইতে লাগিল। রমানাথ দেখিল, সে সেই মনোহর রাজ্যের রাজা, আর বিনোদ তাহার রাণী।

রমানাথ চারি বৎসর কাল এই আশা কল্পিত স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল।

(৪)

বিনু এখন বারো বছরের মেয়ে। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই, হইবার কোন কথাও শুনা যায় না। রমানাথ এখনও আশাসূত্র টুকু ছাড়ে নাই। তবে তাহার মন এখন মাঝে মাঝে সন্দেহদোলায় দুলিতে থাকে। ঘোষাল মহাশয় সত্যই কি বিনুকে তাহার হাতে তুলিয়া দিবেন? তাহার আশা-তরুতে সত্যই কি এই দেবদুর্লভ কুসুম প্রস্ফুটিত হইবে? সত্যই কি তাহার নিদাঘশুষ্ক হৃদয়খাদে বিনোদ-প্রবাহিণী প্রবাহিত হইবে? যদি ঘোষাল মহাশয়ের সেই ইচ্ছাই থাকে, তবে এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? যখন পাত্রপাত্রী উভয়ই উপস্থিত, তখন মেয়ে এত বড় করিয়া রাখা কেন? তবে রমানাথ এই কয়েক

বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া বিনোদের অপেক্ষাও অনেক বড় মেয়ের বিবাহ হইতে দেখিয়াছে। সুতরাং সে ভাবিত, এটা বুঝি দেশাচার।

ইহার উপর মনকে প্রবোধ দিবার আরও কারণ ছিল। সেই চারি বৎসরের পূর্ব্বের কথাটা সে এখনও ভুলে নাই। তারপর এক বৎসর আগে বিনোদের যখন কঠিন ব্যারাম হয়, বাঁচিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তখন রমানাথই ডাক্তার খরচ দিয়া, ঔষধ পথ্যের খরচ যোগাইয়া, রাত জাগিয়া, স্বহস্তে রোগীর মল মূত্র পরিষ্কার করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে। সেই সময়ে—কন্যার সেই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "বাবা রমানাথ, বিনু যদি বাঁচে, তবে সে তোমারই।"

ইহাতেও যদি রমানাথ আশাসূত্রটুকু ছাড়িতে না পারে, তবে তোমরা কি তাহাকে উন্মাদ বলিতে পার ?

তা' তোমরা যাহাই বল না কেন, রমানাথ কিছুতেই আশা ছাড়িতে পারে না ; ছাড়িলে বুঝি সে বাঁচিবে না।

রমানাথ এখনও পূর্ব্বের ন্যায় ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে যাতায়াত করে, এবং বিনুর সহিত গল্প বা হাস্য পরিহাসে সময় কাটায়। তবে বিনু এখন আর বালিকা নয় ; তাহার আর সে বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য নাই, তাহার সহিত কৈশোরের গাম্ভীর্য্য আসিয়া মিশিয়াছে। সে এখন আর রমানাথের সঙ্গে বেড়াইতে যায় না, খেলনা পাইলে তেমন ঘাড় মুখ নাড়িয়া তালি দিয়া নাচিয়া উঠে না, রমাদার গলা জড়াইয়া, চোখে চোখ রাখিয়া আবদার করিতে পারে না। তাহার কথায় যেন একটু সঙ্কোচ আসিয়াছে, চলনে একটু ধীরতা আসিয়াছে, দৃষ্টি একটু লজ্জামাখা হইয়াছে। রমানাথ তাহার এই সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে, আর মনে মনে একটা স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা করিতে থাকে।

সেদিন মধ্যাহ্নে রমানাথ সতীশের সহিত গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘরের বাহিরে দরজার পাশে বসিয়া বিনোদ পুঁতির মালা গাঁথিতেছিল। রমানাথকে ঘুমাইতে দেখিয়া সতীশ আসিয়া দিদির পাশে বসিল, এবং ছড়ান পুঁতিগুলি গুছাইয়া দিয়া দিদির এই শ্রমসাধ্য কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে সতীশ সহসা বলিল, "দিদি তোর বিয়ে।"

বিনোদ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "দূর!"

সতীশ সে ধমকে ভয় পাইল না; ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দূর বৈ কি? আমি শুনেছি, মা বাবাকে বল্‌ছিল।"

বিনোদ চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "কি বল্‌ছিল?"

সতীশ। বল্‌ছিল, রমাদার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

সহসা মালার সূতাটা হাত ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গেল, অনেকগুলি গাঁথা পুঁতি খুলিয়া ছড়াইয়া পড়িল। বিনোদ সেগুলাকে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, "তার পর?"

সতীশ। মা বল্‌লে, রমানাথ ছেলেটী বেশ—

তীব্র শ্লেষের স্বরে বিনোদ বলিল, "হুঁঃ" দিব্যি নব্য ছোকরাটী?"

রমানাথ তখন কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, সতীশ বা বিনোদ তাহা জানিতে পারে নাই।

সতীশ বলিতে লাগিল, "খাওয়া পরার কষ্ট পাবে না।"

বিনোদ বলিল, "পরার না হোক্ খাওয়ার কষ্ট নাই বটে, চমৎকার রাঁধুনী বামুন।"

সেই ক্ষুদ্রকণ্ঠের মৃদুস্বর—যাহা একদিন রমানাথের শ্রবণে অমৃত বর্ষণ করিত, আজি তাহা যেন গর্জ্জনে দিগন্ত কম্পিত করিয়া শত বজ্রের বেগে

রমানাথের হৃদয়ে আঘাত করিল ; সে আঘাতে রমানাথ যেন একটা দুঃস্বপ্ন হইতে সহসা জাগিয়া উঠিল।

(৫)

রমানাথ সেদিন ও সে রাত্রি শুধু ভাবিয়া কাটাইল। তাহার পরদিনও অনেক ভাবিল। ভাবিয়া, শেষে একটা সংকল্প স্থির করিয়া সন্ধ্যার পর ঘোষাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

ঘোষাল মহাশয় তখন আফিস হইতে আসিয়া জলযোগান্তে হুঁকা হাতে বাহিরের ছোট ঘরটিতে বসিয়াছিলেন, এবং তাম্রকূট ধুমপ্রয়োগে চিন্তাশক্তিটাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাঁধুনী বামুনের হাতে মেয়ে দেওয়া সঙ্গত কি না তাহারই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রমানাথকে মেয়ে দিতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা; কিন্তু হইলে কি হয়, একদিকে ইহাতে গৃহিণীর বিশেষ জেদ, অন্যদিকে অর্থাভাব; এই উভয় সঙ্কটে কর্ত্তব্য কি, তাহারই চিন্তায় ঘোষাল মহাশয়ের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছিল। এমন সময়ে রমানাথ আসিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা

ঘোষাল মহাশয় মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "রমানাথ এ সময়ে যে? তোমার চেহারাটা এমন কেন?"

রমানাথ বলিল, "আজ্ঞে, শরীরটা বড় ভাল নাই।"

ঘোষাল। অসুখ বিসুখ হয়েছে না কি?

রমানাথ একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, "এমন বিশেষ কিছু নয়।"

রমানাথ বসিল; বসিয়া অন্যান্য দুই চারি কথার পর বলিল, "বিন্দু বড় হয়ে উঠেছে, তার বিয়ের চেষ্টা না করা আর ভাল দেখায় না।"

ঘোষাল মহাশয় হুঁকায় একটা টান দিয়া বলিলেন, "হুঁ।" মনে মনে ... লেন, "বড় গরজ দেখ্‌ছি যে।"

রমা। আমার মতে আর দেরী করা উচিত নয়; একটা ভাল পাত্র দেখে—

একটু বিরক্তির স্বরে ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "ভাল পাত্র পাব কোথায় ?"

রমা। পাত্রের অভাব কি ?

ঘোষাল। পাত্রের অভাব নাই, কিন্তু টাকার অভাব।

রমা। কত টাকার দরকার ?

ঘোষাল তীব্র দৃষ্টিতে রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি বল্‌ছ ?"

রমা। বলছি, কত টাকা হ'লে ভাল পাত্র পাওয়া যায়।

ঘোষাল। ওরই মধ্যে একটু ভাল খুঁজতে হ'লেও অন্ততঃ চারশত টাকার কমে হয় না।

রমানাথ একটু কাসিয়া, গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "টাকার জন্য ভাবনা নাই, আপনি পাত্র দেখুন।"

ঘোষাল। টাকা দেবে কে ?

রমা। আমি।

রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘোষাল মহাশয় বিস্ময়ের প্রথম বেগটা সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন, "বাপু, একটু দাঁড়াও; তুমি যে এতগুলা টাকা দেবে—"

বাধা দিয়া রমানাথ বলিল, "আমি টাকা আপনাকে দেব না, বিনুকে দেব। কিন্তু একটা কথা।"

ঘোষাল। কি ?

রমা। বিনু যেন এটা জান্‌তে না পারে।

ঘোষাল মহাশয় ভাল করিয়া রমানাথের মুখখানা দেখিয়া ক্রোধের বেগে

করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি ঈষৎ প্রফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "ভাল, তাই হবে। কিন্তু আর একটা কথা, গিন্নী বল্‌ছিলেন—"

রমানাথ বলিল, "তিনি মেয়ে মানুষ, তাঁর কথা ছেড়ে দিন। তাঁকে বল্‌বেন—(রমানাথের স্বরটা জড়াইয়া আসিল), আমার আর এ বয়সে বিয়ে করা সাজে না।"

রমানাথ আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় হুঁকাটা রাখিয়া স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিলেন, "এতদিনে মেয়েটার একটা গতি হ'ল!"

(৬)

টাকা থাকিলে পাত্রের অভাব হয় না। কয়েকদিনের মধ্যেই মনোমত পাত্র পাওয়া গেল। মেয়েকে দুইশত টাকার গহনা এবং ছেলেকে দেড়শত টাকা নগদ দিতে হইবে। বাকী পঞ্চাশ টাকা ঘর খরচ। ঘোষাল মহাশয় রমানাথকে ইহা জানাইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে রমানাথ চারিশত টাকা আনিয়া ঘোষাল মহাশয়ের হাতে দিল। পাঁচ বৎসর খাটিয়া সে এই টাকাগুলি জমাইয়াছিল। কঠোর পরিশ্রমে সঞ্চিত এতগুলি টাকা আজি বিনুর সুখের জন্য উৎসর্গ করিয়া রমানাথ কি সুখ পাইল, তাহা সে-ই বলিতে পারে। ঘোষাল মহাশয় টাকাগুলি গণিয়া তুলিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে গাত্র-হরিদ্রার শঙ্খ ও হুলুধ্বনি উত্থিত হইল। রমানাথ ছুটিয়া সেখান হইতে পলাইল।

পরদিনই কাজে জবাব দিয়া রমানাথ দেশে চলিয়া গেল।

* * * * * *

দেশে গিয়া রমানাথ দেখিল, দুই বৎসর আগে তাহার খুড়ী মারা গিয়াছে ; ঘরের চালে খড় নাই, প্রাচীর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, উঠানে আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে। ঘরের জিনিষপত্র কতক চোরে লইয়া গিয়াছে, কতক প্রতিবাসীরা লইয়া গিয়া রাখিয়া দিয়াছে। ঘরের ভিতর কেবল কয়েকটা ভাঙ্গা হাঁড়ি গড়াইতেছে, আর দেয়ালের গায়ে ঝুলিতেছে সেই সাধের তানপুরাটা। তাহার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আধখানা কাঠ কীটের উদরস্থ হইয়াছে, বাকী আধখানা কাঠ রমানাথের জীর্ণ হৃদয়ের প্রতিরূপ হইয়া তখনও বৃষ্টিধারাঙ্কিত ভিত্তিগাত্রে ঝুলিয়া রহিয়াছে। রমানাথ স্তব্ধশ্বাসে শূন্য দৃষ্টিতে অতীতের সেই জীর্ণ স্মৃতিটুকুর দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে তখন কে গাহিতেছিল,—

মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।

রমানাথ সেই জীর্ণ কাঠখানাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল. সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তাহার চারিপাশে কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিতে লাগিল।

মনের বোঝা

(১)

গুরুদেব বলিলেন, "বৎস, কেবল গৃহত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে হয়, বাসনার বিলোপ করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ যে মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ভোগের চিন্তা করে সে ভণ্ড। অতএব বৎস, অগ্রে মনকে সংযত কর, বাসনা জয়ের জন্য চেষ্টিত হও। তৎপরে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা প্রাপ্ত হইবে।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য। আবার কতদিনে চরণ দর্শন পাইব ?"

গুরুদেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন; "আগামী আষাঢ়ী পূর্ণিমায় পুনরায় এই স্থানে আমার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিবে।"

নগেন্দ্রনাথ গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

কাশীধামে মণিকর্ণিকা ঘাটের কিছুদূরে গঙ্গাতীরে বসিয়া এক তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীর সহিত নগেন্দ্রনাথ উক্তরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার কোন এক গ্রামে নগেন্দ্রনাথের নিবাস। নগেন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান; তিনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারি শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন, এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে আসিয়া বসেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার হাতযশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট অর্থাগমও হইতে লাগিল। এই সময়ে কাল যেন তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যাকে উপহাস করিয়াই প্রিয়তমা পত্নীকে হরণ করিয়া লইল। ত্রিংশদ্‌বর্ষ বয়সে—যৌবনের পূর্ণ উন্মেষকালে পতিপ্রাণা পত্নীকে হারাইয়া নগেন্দ্রনাথ হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন, এত বড় সংসারটা তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হইতে লাগিল, অর্থ, সম্পদ্, বিদ্যার গৌরব সকলই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হইল। আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করিলেন, কত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইলেন; কিন্তু নগেন্দ্রনাথ আর সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিলেন না, বিষয় সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে উইল করিয়া দিয়া, একটা বিষম বৈরাগ্য হৃদয়ে লইয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে রাম ঠাকুরদা বলিলেন, "ভায়া হে, যেখানেই যাও, মনের বোঝাটা নামাইয়া গেলেই ভাল হইত।"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সেইখানেই নামাইব।"

ঠাকুরদা। তাই করিও, তবে বোঝার উপর আবার যেন শাকের আঁটি চাপাইও না।

নগেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া ঠাকুরদার কথার উত্তর দিলেন।

কাশীতে গঙ্গার ধারে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া নগেন্দ্রনাথ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বাড়ী হইতে মাসে কুড়ি টাকা করিয়া আসিত। তাহাতেই আপনার খরচপত্র চালাইতেন, এবং সাধুসন্ন্যাসী-দিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া দিনযাপন করিতেন।

(২)

সন্ধ্যার পর নগেন্দ্রনাথ বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া ফিরিতেছিলেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "তুমি কে গা বাবা ?"

নগেন্দ্রনাথ ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন পশ্চাতে এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধার আকৃতি ও ভাষা বঙ্গদেশীয়ের ন্যায়। নগেন্দ্র উত্তর করিলেন, "কেন গা বাছা ?"

বৃদ্ধা কাতরভাবে কহিল, "তুমি বাবা দয়া ক'রে আমায় বিপিন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে ?"

নগে। ডাক্তারের কাছে কেন ?

বৃদ্ধা। আমার স্থ্রোর বড় অসুখ। বুড়ো মানুষ, রেতের বেলা ঠিক ঠাউরে যেতে পার্‌ব না, তুমি বাবা যদি সঙ্গে যাও।

নগে। তোমার কি ডাক্তার ডাকবার আর লোক নাই ?

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আর কে আছে বাবা ? ঐ এক নাতনি ছাড়া তিনকুলে কেউ নাই।"

নগেন্দ্রনাথ বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তারের বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু ডাক্তার বাবু তখন রোগী দেখিতে বাহিরে গিয়াছেন। বৃদ্ধা হতাশ স্বরে বলিল, "হা ভগবান, তবে কি হবে ?"

নগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাতনীর কি অসুখ ?"

বৃদ্ধা। আজ পাঁচদিন হলো, তার জ্বর হয়েছে, কিন্তু আজ সন্ধ্যার আগে হ'তে অসুখ বেড়েছে ; ডাকলে সাড়া দেয় না, আপনার মনে কত কি ভুল বক্‌ছে। এদিকে ডাক্তার বাড়ী নাই। আমার স্থ্রোর কি হবে ?

বৃদ্ধার স্বর কাতরতাপূর্ণ, বাষ্পগদগদ। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আচ্ছা, ফিরে চল, আমি তোমার নাতনীকে দেখ্‌বো।"

বৃদ্ধা সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে নগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিল ; কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনিও একজন পাশ-করা ডাক্তার, তখন বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না। সে সাদরে নগেন্দ্রনাথকে বাড়ীতে লইয়া গেল।

বাড়ীখানি ছোট, একতালা। বাড়ীতে দুইখানি মাত্র ঘর। বাড়ীর ভিতর অন্ধকার, কেবল একটী ঘরের ভিতর মিটমিট করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। নগেন্দ্রনাথ বৃদ্ধার পশ্চাৎ সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিলেন, সেই ক্ষুদ্র অপরিচ্ছন্ন গৃহে ছিন্ন মলিন শয্যার উপর এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কিশোরী হিমবিশীর্ণা নলিনীর ন্যায় নিপতিতা। কিশোরীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশের ন্যূন হইবে না। তাহার দেহে রূপ যেন আর ধরিতেছে না, যৌবনের নব আবেশে সে রূপ যেন উছলিয়া উঠিয়াছে ; ব্যাধির নিদারুণ আক্রমণও সে সৌন্দর্য্যরাশিকে ম্লান করিতে পারে নাই।

নগেন্দ্রনাথ রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা শুনিলেন, তারপর বৃদ্ধাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরেই তিনি ঔষধপত্রাদিসহ ফিরিয়া আসিয়া স্বহস্তে রোগিণীকে ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রনাথ কেবল ঔষধ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নিজ ব্যয়ে রোগীর শয্যা পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন, উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন, এবং স্বয়ং রোগীর পার্শে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসকের প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে রোগের অবস্থা ফিরিয়া দাঁড়াইল ; রোগীর আর জীবনের আশঙ্কা নাই দেখিয়া নগেন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইল, তিনি প্রাণের মধ্যে একটা স্বস্তি বোধ করিলেন।

(৩)

নগেন্দ্রনাথ বৃদ্ধার নিকট তাহার যে ইতিহাস শুনিলেন, তাহা এইরূপ ;—

নদীয়া জেলায় রামনগর গ্রামে বৃদ্ধার বাড়ী ছিল। একমাত্র কন্যা ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধা অনেক খরচ পত্র করিয়া এক সম্ভ্রান্ত ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জামাতা কন্যাকে সুদৃষ্টিতে দেখিলেন না। কিছুদিন পরে জামাতা পুনরায় বিবাহ করিলেন, অভিমানিনী কন্যা স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া মাতার নিকট আশ্রয় লইলেন। ইহার পর অনেক সাধ্য সাধনায় জামাতা একবার মাত্র সেখানে আসিয়াছিলেন। সেই সময়েই সুরবালার জন্ম হয়। কিন্তু জামাতা সেই যে গেলেন আর আসিলেন না, স্ত্রীকন্যারও কোন খোঁজখবর লইলেন না।

সুরবালার মাতা স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া জীবন ধারণ বিড়ম্বনা জ্ঞান করিলেন ; দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর নানা রোগের আধার হইল। শেষে তিনি তিন বৎসরের মেয়েটিকে মায়ের হাতে সঁপিয়া দিয়া নির্ম্মম সংসার ত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধা কন্যাশোকে মুহ্যমানা হইয়া পড়িলেন, তিনি বিষয় আশয় সমস্ত বিক্রয় করিয়া তিন বৎসরের দৌহিত্রীকে লইয়া কাশীবাসিনী হইলেন।

সে আজ দশ বার বৎসরের কথা। বৃদ্ধা বহু কষ্টে সুরবালাকে মানুষ করিতে লাগিলেন। কতবার যমদূত আসিয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে সুরবালাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ও বৃদ্ধার যত্নে তাহারা সফলকাম হইতে পারে নাই। এইরূপে সুরবালা ক্রমে চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল, কিন্তু বৃদ্ধা তাহার বিবাহ দিতে পারিল না। এখানে পাত্র অনেক মিলে, কিন্তু সুপাত্র সহজে পাওয়া যায়

না। পাওয়া গেলেও কেহ এই অপরিচিতার দৌহিত্রীকে গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। এখান হইতে বঙ্গদেশে গিয়া কে তাহার কুলশীলের অন্বেষণ করিবে? বিশেষতঃ বৃদ্ধার নিকট কিছু পাইবারও আশা নাই। এদিকে বৃদ্ধা প্রাণ ধরিয়া সোণার প্রতিমাকে কুপাত্রের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না। অগত্যা সুরবালার এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, হইবে কি না তাহা ভগবান্ জানেন।

সুরবালার ইতিহাস শুনিয়া নগেন্দ্রনাথের চিত্ত করুণায় আর্দ্র হইল, মাতৃহীনা পিতৃস্নেহ-বঞ্চিতা সুরবালার উপর তাঁহার একটা সহানুভূতিপূর্ণ প্রবল অনুরাগের আবির্ভাব হইল। হায়, সুরবালার ন্যায় সুন্দরী, যাহা রাজপ্রাসাদ আলোকিত করিবার উপযুক্ত, তাহা অনাদরে অবজ্ঞায় এই অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহে লোকলোচনের অন্তরালে লুণ্ঠিত হইতেছে! নগেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, আগে ইহাকে রোগমুক্ত করি, তার পর যে রূপে হউক সুপাত্রে অর্পণ করিতেই হইবে।

পরিচয়ে জানিলেন, সুরবালার পিতার নাম শশধর মুখোপাধ্যায়। তাহারা তাঁহাদেরই পাল্‌টি ঘর।

(৪)

এক পক্ষ কাল পরে সুরবালা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইল, রাহুগ্রাস-বিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় তাহার লাবণ্য-জ্যোতিঃ আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, পাণ্ডু অধরে আবার রক্তিমরাগ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল, জ্যোতিহীন দৃষ্টি প্রফুল্ল নীলোৎপলশোভা প্রাপ্ত হইল, রোগশীর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবার সুপুষ্ট সুগোল হইতে লাগিল; নিদাঘসন্তপ্তা মাধবী বর্ষাবারি সংস্পর্শে সঞ্জীবিতা হইয়া পত্রপুষ্পে শোভিতা হইয়া উঠিল।

নগেন্দ্রনাথ এই এক পক্ষ কাল দিবা ও রাত্রির অধিকাংশ সময় সুরবালার পার্শ্বে বসিয়াই যাপন করিয়াছেন। সুরবালা ঘুমাইলে তিনি

পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেন, জাগিয়া উঠিলে ঔষধ খাওয়াইতেন, গল্প করিয়া তাহাকে প্রফুল্লচিত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। সুরবালাও তাঁহার গল্প শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িত, রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া অনিমিষ নেত্রে চিকিৎসকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, কখন বা তাঁহার হাতের উপর আপনার রোগশীর্ণ হাতখানি রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া নীরবে পড়িয়া থাকিত।

রোগী রোগমুক্ত হইলে তাহার সহিত আর চিকিৎসকের কোন সম্বন্ধ থাকে না, ইহাই সনাতন নিয়ম, কিন্তু এক্ষেত্রে সে সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। সুরবালার আরোগ্যের পরও নগেন্দ্রনাথ প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ইহাতে বৃদ্ধা কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেন না, বরং যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিতেন। নগেন্দ্রনাথ যে তাঁহাদের বিপদের বন্ধু। ইহা ছাড়া বৃদ্ধার মনে আর একটা আশা ছিল, কিন্তু নগেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস গ্রহণের অভিলাষ শুনিয়া তিনি সে আশার উপর বড় একটা নির্ভর করিতে পারিলেন না।

এরূপ যাতায়াতে নগেন্দ্রনাথের মন যে সুরবালার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িবে তাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝেন নাই। যখন বুঝিলেন, তখন ভাবিলেন, "হায়, আমি এ কোন্ পথে চলিয়াছি? একবার সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া আবার তাহাতে বিজড়িত হইব? কখনই না। সুরবালা সুন্দরী, আমার তা'তে কি? তাহাকে বিবাহ করিলে (কথাটা ভাবিতেই নগেন্দ্রনাথের বুকটা যেন নাচিয়া উঠিল)—বিবাহ করিলে কি সুখী হইব? দুঃখময় সংসারে সুখ কোথায়? সকলই মায়া—মায়া; সুরবালা মায়া, তাহার সৌন্দর্য্য মায়া, তাহাকে আপনার করিবার ইচ্ছাও মায়া! আমি আর এ সর্ব্বনাশীর নিকট যাইব না! অতীত ঘটনাকে রজনীর দুঃস্বপ্নের ন্যায় ভুলিতে চেষ্টা করিব।"

নগেন্দ্রনাথ সে দিন আর স্থরবালার কাছে গেলেন না, কিন্তু সে দিন রাত্রিটা বড় কষ্টেই কাটিল। প্রভাতে উঠিয়া নগেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, যেখানে প্রত্যহ দুই তিনবার যাইতাম, সেখানে একবারে না যাওয়া ভাল দেখায় না। স্থরবালা কি মনে করিবে, বৃদ্ধাই বা কি ভাবিবে? কাল না যাওয়ায় তাহারা হয় তো কতই ভাবিতেছে। আর এরূপে যাওয়া আসায় ক্ষতি কি? আমার মন তো এখনও ঠিক আছে!

নগেন্দ্রনাথ যদি আপনার মনের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, তাঁহার মন-মধুকর আর স্বস্থানে নাই, তাহা এক্ষণে স্থরবালা-কুসুমের চারি পাশে গুন্ গুন্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথ এতটা দেখিবার অবসর পাইলেন না, তিনি তাড়াতাড়ি স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া স্থরবালার নিকট চলিলেন।

স্থরবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কাল আপনি আসেননি কেন?"

নগেন্দ্রনাথ কি উত্তর দিবেন সহসা খুঁজিয়া পাইলেন না; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কাল শরীরটা যেন—যেন একটু—"

স্থরবালা ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "অসুখ করেছিল না কি? কি অসুখ?"

নগেন্দ্র যেন লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "না না, অসুখ কিছু নয়। দিদিমা কোথায়?"

স্থর। তিনি গঙ্গাস্নানে গেছেন।

নগে। আমি না এলে কি তোমার ভাবনা হয় স্থরো?

স্থরো তাহার চম্পকাঙ্গুলিতে অঞ্চলপ্রান্ত জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "দিদিমা বড় ভাবেন।"

মৃদু হাসিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর তুমি?"

সুরবালার মুখ লাল হইয়া উঠিল ; সে মাটির দিকে চাহিয়া, একটা ঢোক্ গিলিয়া লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "আপনার গল্প শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।"

নগেন্দ্রনাথ তাহার লজ্জারক্তিম মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু সুরো, আমার গল্প আর ক'দিন শুন্‌বে ?"

সুরবালা মুখ তুলিয়া চাহিল ; মুহূর্ত্তে চারিচক্ষু সম্মিলিত হইল। সুরবালা লজ্জায় মুখ নামাইয়া ঈষৎ উদ্বেগপূর্ণ স্বরে বলিল, "কেন, আপনি কি এখানে থাক্‌বেন না ?"

নগেন্দ্রনাথ সহাস্যে বলিলেন, "আমি এইখানেই থাক্‌বো বটে, কিন্তু তোমার ত বিয়ের বয়স হয়েছে।"

সুরবালা নীরবে আপনার পদাঙ্গুষ্ঠের নৃত্য দেখিতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোমার জন্য একটী ভাল পাত্রের যোগাড় দেখছি।"

কথাটা বলিতে নগেন্দ্রনাথের কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিল। একটু হাসিলেন বটে, কিন্তু সে হাসি যেন প্রাণহীন। কথাটা শুনিয়া সুরবালা একবার কাতরদৃষ্টিতে নগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিল। নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সুরোর চোখ দুইটা যেন জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

সুরবালা ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া লইল। এমন সময় বৃদ্ধা স্তব পাঠ করিতে করিতে বাড়ীতে আসিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত দুই চারি কথা কহিয়া, সুরবালার সেই করুণ দৃষ্টিটুকু হৃদয়ে গাঁথিয়া লইয়া সেদিন বাসায় চলিয়া গেলেন।

বৈরাগ্য বলিল,—"ওরে মূর্খ! এই জন্যই কি গৃহত্যাগ করিলি ?"

মন বলিল,—"তা কি এমন অন্যায় করেছি ? এখনও তো বিয়ে করি নাই।"

বৈ। কর নাই, কিন্তু শীঘ্রই করবে।

মন। তাই যদি করি তাতেই বা ক্ষতি কি? তোমার গেরুয়া বাঘছাল অপেক্ষা ইহাতে বেশী সুখ আছে।

বৈ। কিন্তু এ সুখ অনিত্য।

মন। সংসারে কোন্‌টাই বা নিত্য?

বৈ। তোমার এ সুখ দুঃখমিশ্রিত।

মন। আর তোমার সুখ পাবার জন্য তো আগে দুঃখের বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে।

বৈ। কিন্তু তার পরিণামে অনন্ত সুখ।

মন। সেটা অনিশ্চিত।

বৈ। তুমি নিতান্ত মূর্খ। এখনও সাবধান হও, সে মায়ার পাশটাকে ভুলে যাও। জান তো—"কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি—নারী।"

মন। ভুল্‌তে তো চাই, কিন্তু পারি কই? সে যে অপূর্ব্ব সুন্দরী!

বৈ। বর্দ্ধমান জেলায় সুন্দরীর অভাব ছিল না।

মন। সে কথা ঠিক।

বৈ। তবে এতদূর এলে কেন?

মন। কর্ম্মফল।

বৈ। তুমি তোমার কর্ম্মফল ভোগ কর, আমি চলিলাম।

মন। একবারে যেও না, দিন কতক সবুর কর। গুরুদেব শীঘ্রই ফিরে আসবেন। তিনি এসে যেমন অনুমতি করবেন তেমনই হবে।

বৈ। তিনি এসে তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় করবেন।

মন। বেশ, তাতে তোমার বৈরাগী ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল।

বৈরাগ্য ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান করিবামাত্র বাসনাসুন্দরী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। মন বলিল, "কেমন সুন্দরি, সব শুন্‌লে তো?"

বিম্বাধরে মধুর হাসি ছড়াইয়া সুন্দরী বলিল, "দেখ দেখি, এতদিনে তুমি ঠিক পথে এসেছ।"

মন বলিল, "সে তোমারই দয়ায়।"

সুন্দরী তখন হাসিতে হাসিতে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া মনকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিল।

নগেন্দ্রনাথ কোন্ পথটা অবলম্বনীয় তাহা সম্পূর্ণ স্থির করিতে না পারিলেও সুরবালাদের বাটীর পথে নিয়মিতরূপে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

(৫)

সে দিন অপরাহ্ণে নগেন্দ্রনাথ সুরবালার নিকট যাইতেছিলেন। তিনি যখন বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন দেখিলেন, জনৈক ভদ্রবেশধারী বাঙ্গালী সুরবালাদের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিলেন, কে এ লোকটা?

ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্রনাথ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা বাটীতে নাই, সুরবালা একা বসিয়া কি ভাবিতেছে। নগেন্দ্রনাথের মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সুরবালা তাঁহাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া আসন দিল। নগেন্দ্রনাথ অধিকক্ষণ থাকিলেন না, দুই চারিটা কথা কহিয়াই চলিয়া আসিলেন।

কেবল সে দিন নয়, আরও দুই তিন দিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই লোকটাকে বাটী হইতে বাহিরে আসিতে দেখা গেল। সেই সময়ে কখন বৃদ্ধা বাটীতে থাকিতেন, কখন বা থাকিতেন না। নগেন্দ্রনাথ

অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না লোকটা কে, বা তাহার উদ্দেশ্য কি। কখন ভাবিলেন, হয় তো বৃদ্ধার কোনও আত্মীয় হইবে। কিন্তু বৃদ্ধা বলিয়াছেন, তাঁহার তিন কুলে কেহই নাই। নগেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। নানাবিধ সন্দেহ আসিয়া চিত্তকে অধিকার করিল।

সুরবালাকে বা তাহার দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তো সকল গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে গেলে হয় তো গোল আরও বাড়িবে, উহারাই যে সত্য পরিচয় দিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি। কিন্তু সুরবালা, যে সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া, গুণে আদর্শস্বরূপা, তাহার চিত্ত কি এতই নীচ হইবে? অথবা ইহার অসম্ভাব্যতাই বা কি, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, গোলাপে কণ্টকই ইহার প্রমাণ।

নগেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার এত বিচারে আবশ্যক কি? সুরবালা সাক্ষাৎ মোহপাশ, সে আমাকে আবার সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিতেছিল। আপনা হইতে সে পাশ খুলিয়া গেল; ভালই হইল। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় দূরীভূত হইল।"

এতটা ভাবিয়াও নগেন্দ্রনাথ স্থির হইতে পারিলেন না, আশার নিস্ফলতা জনিত ক্রোধ আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, একবার ভাল করিয়া দেখিব ব্যাপারটা কি? কে সেই পাপিষ্ঠ আসিয়া আমার সুরবালাকে টানিয়া লইতেছে। হয় তো কোন ধূর্ত্ত আসিয়া সুরবালার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। যদি তাই হয়, তবে সে প্রবঞ্চকের হস্ত হইতে সুরবালাকে উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু সুরবালা যদি তাহাকে ভালবাসিয়া

থাকে—অসম্ভব, অসম্ভব! নগেন্দ্র দুই হাতে বুক চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব, অসম্ভব!"

নগেন্দ্রনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উন্মত্তের ন্যায় সুরবালাদের বাটীর দিকে চলিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরাতল আচ্ছন্ন হইয়াছে।

বাটীর দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল না, নগেন্দ্র ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিলেন এবং চোরের ন্যায় পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে অন্ধকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তখন রন্ধনশালায় বসিয়া মালা জপিতেছিলেন, সম্মুখের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। নগেন্দ্র নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই ঘরের দ্বারের নিকট আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল, রোষে ক্ষোভে সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলেন, পূর্ব্বদৃষ্ট লোকটী শয্যার উপর শুইয়া আছে, আর সুরবালা তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। নগেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল, তিনি উন্মাদের ন্যায় গৃহমধ্যে ছুটিয়া গেলেন।

আগন্তুক চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, ; ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "কে তুই?"

সুরবালা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু নগেন্দ্রনাথের ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া একটী কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?"

"তোমার যম" বলিয়া নগেন্দ্রনাথ লাফ দিয়া তাহার উপর পড়িলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে ভূপাতিত করিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিলেন। সুরবালা অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সহসা দ্বারদেশ হইতে কে বজ্রগম্ভীরস্বরে ডাকিল, "নগেন্দ্রনাথ!"

নগেন্দ্রনাথ ফিরিয়া চাহিলেন ; দেখিলেন, গুরুদেব।

গুরুদেব গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "উঠিয়া আইস।"

নগেন্দ্রনাথ আগন্তুককে ছাড়িয়া উঠিলেন, এবং কম্পিতবক্ষে গুরু-দেবের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন।

গুরুদেব বলিলেন, "এই কি তোমার চিত্তসংযম নগেন্দ্রনাথ ?"

নগেন্দ্রনাথ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "গুরুদেব, আমি মহাপাপী, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

গুরু। প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু তাহা অতি কঠোর।

নগে। আজ্ঞা করুন।

গুরু। তোমাকে সুরবালার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে।

নগেন্দ্রনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "অসম্ভব !"

গুরুদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সম্পূর্ণ সম্ভব বৎস, তোমার রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে। এই ব্যক্তি সুরবালার পিতা, ইহারই নাম শশধর মুখোপাধ্যায়।"

নগেন্দ্রনাথ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে গুরুর মুখের দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ইনি প্রায় সপ্তাহ পূর্ব্বে কাশীতে আসিয়াছেন। বিশ্বে-শ্বরের মন্দিরে সুরবালার মাতামহীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইঁহাকে চিনিতে পারেন, এবং একবার সুরবালাকে দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। অপত্যস্নেহের অদ্ভুত আকর্ষণ ! একবার দেখা করিয়া আর ইনি সুরবালাকে ভুলিতে পারিলেন না ; প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতেছেন এবং তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।"

নগেন্দ্রনাথের হৃদয় হইতে সন্দেহমেঘ তিরোহিত হইল ; তিনি লজ্জায় বদন অবনত করিলেন।

তাহার পর যাহা হইল তাহা না বলিলেও চলে। সুরবালার সহিত

নগেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ সুরবালাকে লইয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাম ঠাকুর দা বলিলেন, "ভায়া হে, সঙ্গিনীটী কে?"

নগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আপনার শাকের আঁটি।"

ঠাকুরদা বলিলেন, "আমি বুড়া হইয়াছি, আর শাকপাত হজম হয় না। এটা তুমিই নিজের ভোগেই লাগাও।"

পূজা

(১)

"ওমা শঙ্করি !"

"কেন বাবা ?"

তখন প্রভাত হইয়াছে ; শারদ পঞ্চমীর নবারুণরাগে শিশিরসিক্ত বৃক্ষপল্লব রঞ্জিত হইয়াছে ; শ্যামশষ্পশীর্ষে হিমকণা মুক্তাফলের অনুকরণ করিতেছে ; রায় বাবুদের বাড়ীতে পূজার ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে ; গৃহস্থের দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া ভিখারী গাহিতেছে,—

গা তোলো গা তোলো বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী ।

শরতের এমনই আনন্দোজ্জ্বল প্রভাতে আপনার গৃহের রোয়াকে বসিয়া চূড়ামণি ডাকিলেন,—

"মা শঙ্করি !"

শঙ্করী গোময়লিপ্ত হস্তে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, "কেন বাবা ?"

চূড়ামণি কিছু বলিলেন না, কেবল একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নামাইয়া লইলেন ।

শঙ্করী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বাবা ?"

চূড়ামণি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এমন কিছু না ; বলি—আজ—আজ না পঞ্চমী ?"

শঙ্করী দেখিল, পিতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। সে পিতার বেদনাতুর হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা আপনার হৃদয় দিয়া অনুভব করিল; তাহারও ভাসা ভাসা চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল; কোমলার্দ্র কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

"পাঁচ বছর বয়স হ'তে মা'র পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আস্‌ছি শঙ্করি।"

বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত চূড়ামণির চক্ষু দিয়া হু হু জল গড়াইয়া পড়িল। পিতার সহিত কন্যারও চোখের জলের স্রোত কপোলদেশ প্লাবিত করিয়া ছুটিল। একটু পরে চূড়ামণি প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার চোখ মুছিলেন; তারপর উঠিয়া বসনপ্রান্ত দিয়া কন্যার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা'র ইচ্ছা শঙ্করি, সকলই মা'র ইচ্ছা।"

শঙ্করী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বাবা, যে আমাদের এমন সুখের হাট ভেঙ্গে দিলে, মা কি তার বিচার—"

বাধা দিয়া চূড়ামণি বলিলেন, "ছিঃ মা, অভিশাপ দিও না। অদৃষ্ট— সবই আমাদের অদৃষ্ট।"

চূড়ামণি বাহিরে চলিয়া গেলেন, শঙ্করী পুনরায় গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল।

(২)

গতবর্ষেও পঞ্চমীর প্রভাতে শারদ সূর্য্য দাসপুর গ্রামের উপর এমনই মধুর হাস্যচ্ছটা ছড়াইয়া দিয়াছিল, সে হাস্যকিরণ স্পর্শে গ্রামবাসীরা এমনই হাসিতে হাসিতে শয্যাত্যাগ করিয়াছিল, এমনই করিয়া ভিখারী আগমনীর মধুর সঙ্গীত গাহিয়া দিকে দিকে আনন্দময়ীর শুভাগমন ঘোষণা করিয়াছিল। রায় বাবুদের বাটীতে এমনই করিয়া ঢাক ঢোলের উচ্চ শব্দ উঠিয়া প্রভাত গগন প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। আর তাহারই মধ্যে চূড়ামণির ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপে সদ্যঃসজ্জিতা ক্ষুদ্র প্রতিমার সম্মুখে একটী

ঢাক মৃদুগম্ভীর রবে চূড়ামণির ক্ষুদ্র গৃহখানির মধ্যে আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাস তুলিয়া দিয়াছিল।

বর্ষান্তে আবার সেই শারদ পঞ্চমীর প্রভাত আসিয়াছে, আনন্দময়ীর আগমনে বঙ্গের গৃহে গৃহে আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, কেবল চূড়ামণির গৃহে সে উচ্ছ্বাস নাই; ক্ষুদ্র চণ্ডীমণ্ডপখানি আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে আনন্দময়ীর সে আনন্দ-প্রতিমা নাই; চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে সেই প্রাচীন আমগাছটী আছে, কিন্তু তাহার তলায় রাধু ঢাকীর ঢাক কাঁধে আর সে সানন্দ নৃত্য নাই; সে এ বৎসর শ্যামনগরে ঘোষেদের বাড়ীতে বাজাইতে গিয়াছে।

রায় বাবুদের পূজার ন্যায় চূড়ামণি মহাশয়েরও বহুকালের পৈতৃক পূজা। জমিদারবাড়ীর মত সে পূজায় ধুমধাম না হইলেও তাহাতে আনন্দের বা ভক্তির ন্যূনতা ছিল না। কিন্তু গত বৎসর পূজার সময় এমন এক ঘটনা ঘটিল যে, চূড়ামণিকে বাধ্য হইয়া পৈতৃক পূজা বন্ধ করিতে হইল।

জমিদার মথুরানাথ রায়—চূড়ামণি মহাশয়ের পৈতৃক যজমান। নিজ বাড়ীতে পূজা হইলেও চূড়ামণিকে পূজার কয়দিন মধ্যে মধ্যে যজমান বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া পূজার তত্ত্বাবধান করিতে হইত। গত বৎসরেও চূড়ামণি নবমীর দিনে নিজের বাটীর পূজা শেষ করিয়া মথুর বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেখানে তখন পূজা শেষে বলিদানের আয়োজন হইতেছিল। সে বলিদান এক বৃহৎ ব্যাপার। প্রায় শতাধিক ছাগ বলির জন্য উৎসৃষ্ট হইয়া সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে, দুইটা বৃহৎ মহিষের স্কন্ধদেশে দশ বার জনে মিলিয়া ঘৃত মর্দ্দন করিতেছে। তিনজন কামার খড়্গে উকা ঘষিতেছে। বলিদান দেখিবার জন্য দুই তিন ক্রোশ দূর হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেছে; শত শত দর্শকে বৃহৎ প্রাঙ্গণ

পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিদানের প্রতীক্ষা করিতেছে।

যথাসময়ে মথুরবাবু পট্টবস্ত্র, রক্তচন্দন ও রুদ্রাক্ষ মাল্যে ভূষিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। পুরোহিত-চূড়ামণি মহাশয় অনুমতি দিলেন, বলিদান আরম্ভ হইল। তখন দর্শকদলের মা মা শব্দে উচ্চ চীৎকারে, ঢাকঢোলের বিকট ধ্বনিতে, এবং যূপকাষ্ঠবদ্ধ ছাগের করুণ আর্ত্তনাদে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল, অদূরে রজ্জুবদ্ধ ছাগদল স্বজাতীয়গণের পরিণাম দেখিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, প্রণালী দিয়া রক্তের স্রোত বহিয়া চলিল।

একজন লোক পরের পর এক একটা ছাগ আনিয়া যূপকাষ্ঠের নিকট উপস্থিত করিতেছিল। সহসা একটা ছাগ তাহার হাত ফস্‌কাইয়া ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু সে পলাইবে কোথায়? চারিদিকেই মৃত্যু বা মৃত্যুর অনুচররূপী অসংখ্য জনশ্রেণী পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান। ভীত ছাগশিশু একবার এদিকে, একবার ওদিকে ছুটিয়া শেষে ভয়ার্ত্ত শিশু যেমন মা'র ক্রোড়ে নির্ভর আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমনই চূড়ামণির কোলে আসিয়া লুকাইল। একজন ছুটিয়া পলায়মান ছাগটীকে ধরিতে আসিল। চূড়ামণি গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন, "দাঁড়াও।" সে দাঁড়াইয়া পড়িল। সকলেই সোৎসুক দৃষ্টিতে চূড়ামণির দিকে চাহিল।

চূড়ামণি মথুরবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছোটবাবু, এটাকে ছেড়ে দিন।"

পূজক মহাশয় দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ! উৎসৃষ্ট পশুকে ছেড়ে—"

চূড়ামণির তীব্র দৃষ্টি-দর্শনে পূজক মহাশয় বক্তব্যটা শেষ করিতে পারিলেন না। তখন চূড়ামণি পুনরায় মথুরবাবুর দিকে চাহিয়া ডাকিলেন, "ছোটবাবু!"

মথুরবাবু বলিলেন, "আপনার অন্যায় অনুরোধ।"

চূড়া। অন্যায় নয়, আমি এই আশ্রিত জীবের প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি, আপনি আমাকে ভিক্ষা দিন।

মথুর। যা' একবার মাকে দান করিয়াছি, তার দানে আর আমার অধিকার নাই। অনর্থক সময় নষ্ট করিবেন না।

মথুরবাবুর ইঙ্গিতে পূর্ব্বোক্ত লোকটী গিয়া ছাগকে ধরিল। ছাগশিশু একবার সকাতর দৃষ্টিতে চূড়ামণির মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি কি করুণ, কি আকুল প্রার্থনায় পূর্ণ! সেই ভাষাহীন করুণ দৃষ্টি যেন অব্যক্ত-স্বরে বলিতেছে—"ওগো রক্ষা কর—মৃত্যুর হাত হ'তে আমায় রক্ষা কর।" চূড়ামণির হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল; হায়, আজি তিনি একটা আশ্রিত ক্ষুদ্র জীবকে রক্ষা করিতে পারিলেন না! চূড়ামণি ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ছেড়ে দাও, ছোটবাবু, ছেড়ে দাও, এই আশ্রিত পশুকে বধ ক'রে মার কোপে পড়বেন না।"

কিন্তু কে তাঁহার কথা শুনিবে? তখন প্রাণভয়ে ভীত ছাগ যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া করুণ চীৎকারে আপনার প্রাণভিক্ষা চাহিতেছে। কিন্তু কে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে? ঘাতক তখন রক্তলোলুপ, দর্শকবৃন্দ নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি, দেবীপ্রতিমা পাষাণময়ী। চূড়ামণি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, তিনি সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইলেন; কেবল তাঁহার আকুল কণ্ঠ তখনও চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া বলিতেছিল, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।"

সে স্বরে নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতও বুঝি কাঁপিয়া উঠিল; সে কম্পিত হস্তে ছাগের কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিল; কিন্তু সে আঘাতে কণ্ঠ দ্বিধা বিভিন্ন হইল না, দ্বিতীয় আঘাতে ছাগের মুণ্ড তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

দর্শকবৃন্দের বুক দুর্ দুর্ কাঁপিয়া উঠিল, ঢাকীর হাত হইতে ঢাকের কাঠী পড়িয়া গেল, মথুরবাবু প্রতিমার সম্মুখে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা জগদম্বে, রক্ষা কর মা, রক্ষা কর।"

যে একটা ক্ষুদ্র পশুর উপর সামান্যমাত্র করুণা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ, সে-ই আবার জগজ্জননীর দ্বারে গিয়া অসঙ্কোচে করুণার ভিখারী হয়!

(৩)

সে বৎসরটা মথুরবাবুর বড় ভাল গেল না। পূজার পরই তিনি একটা সঙ্গীন মামলায় হারিয়া গেলেন। তাহাতে তাঁহার একটা মহালের কতকটা অংশ পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের অধিকারভুক্ত হইল। সে অংশটার আয় প্রায় সাত হাজার টাকা। মথুরবাবু সহজে এতটা আয়ের মায়া ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি দখলীস্বত্ব লইয়া একটা দাঙ্গা বাধাইয়া দিলেন। সে দাঙ্গায় উভয়পক্ষেই দুইদশজন আহত হইল, মথুরবাবুর নায়েব স্বরূপচন্দ্র ও কয়েকজন পাইক শান্তিভঙ্গ, অনধিকার প্রবেশ, মারপিট ইত্যাদি অনেকগুলি অপরাধে অভিযুক্ত হইল। মোকদ্দমায় জলের মত টাকা খরচ হইতে লাগিল। মথুরবাবু জয় কামনায় জগদম্বার নিকট যুগল মহিষ বলি মানসিক করিলেন।

জগদম্বার বোধ হয় তখন মহিষ-রুধির পানে অরুচি জন্মিয়াছিল, তাই সাত মাস পরে বিচার নিষ্পত্তি হইলে সকলেই শুনিল যে, নায়েব স্বরূপচন্দ্র তিনজন পাইকের সহিত তিন বৎসরের জন্য শ্রীঘরবাসের আদেশ পাইয়াছে। অন্যান্য পলাতক আসামীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে।

মথুরবাবু আপীল করিলেন। একমাস পরে সংবাদ আসিল, আপীল নামঞ্জুর।

ক্রোধে, ক্ষোভে মথুরবাবু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলেন। তাঁহার

সমস্ত রাগটা গিয়া চূড়ামণির উপর পড়িল। সেই হতভাগা ব্রাহ্মণটা যদি পাঁটাটাকে লইয়া এত কাণ্ড না বাধাইত, সে যদি ব্রাহ্মণত্বের অসার গৌরবে আঘাত পাইয়া অভিশাপ না দিত, তবে কখনই এমন কাণ্ড ঘটিত না। মথুরবাবুর ইচ্ছা, একদিনেই এই ব্রাহ্মণের ভিটাটা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিন্তু বৃটিশরাজত্বে ইচ্ছামাত্রই তাহার পূরণ অসম্ভব। অতএব যতটা সম্ভব মথুরবাবু ততটাই করিলেন।

চূড়ামণি সেই যে পূজার সময় চলিয়া গিয়াছিলেন, আর যজমান বাড়ীতে আসেন নাই, মথুরবাবুও তাঁহাকে ডাকেন নাই। যখন ডাকিলেন, তখন চূড়ামণি শুনিলেন, তিনি এ পর্য্যন্ত পৈতৃক নিষ্কর সম্পত্তি বোধে যে সকল সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার মধ্যে বাস্তু ও কয়েক কাঠা ডাঙ্গামাত্র ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, অবশিষ্ট একত্রিশ বিঘা জমি সমস্তই জমিদারের মাল; তিনি কেবল এতদিন জমিদারকে বঞ্চনা করিয়া আসিতেছিলেন। বঞ্চিত জমিদার মহাশয় আপনার অবশ্য প্রাপ্য সম্পত্তি বুঝিয়া লইলেন, পুরোহিত বলিয়া তাঁহার নামে আর প্রবঞ্চনার অভিযোগ আনিলেন না।

এই জমির আয়ই চূড়ামণির সর্ব্বস্ব ছিল। সে সর্ব্বস্ব গেল। এদিকে জমিদারবাটীর পৌরোহিত্যও বন্ধ। তবে সংসারে একমাত্র বিধবা কন্যা ছাড়া আর কেহ নাই, সুতরাং আহারাদি বন্ধ হইল না, কষ্টে চলিতে লাগিল; কিন্তু পৈতৃক পূজা বন্ধ করিতে হইল।

(৪)

"চূড়ামণি, আমি এসেছি।"

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, ব্যথিত হৃদয়ের অশ্রুরাশি জগদম্বার চরণে ঢালিয়া শেষ রাত্রিতে চূড়ামণি একটু ঘুমাইয়াছিলেন, সহসা যেন তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইল, "চূড়ামণি" আমি এসেছি।"

চূড়ামণি ত্রস্তে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকরেখা আসিয়া শয্যা স্পর্শ করিয়াছে; রায় বাবুদের বাটীর নহবতে বিভাষের মধুর তান উত্থিত হইয়া প্রভাত গগন প্লাবিত করিতেছে; বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিখারী গাহিতেছে,—

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এল পাষাণি তোর ঈশানী।

চূড়ামণি রোমাঞ্চিতকলেবরে উঠিয়া বসিলেন। বাহির হইতে শঙ্করী ডাকিল, "বাবা!" চূড়ামণি উঠিয়া দরজা খুলিলেন; তখনও তাঁহার কর্ণে যেন ধ্বনিত হইতেছিল, "আমি এসেছি।"

চূড়ামণি আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "শঙ্করি, মা এসেছে।"

শঙ্করী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ বাবা, দেখ্‌বে এস।"

চূড়ামণি বিস্ময়ে স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্। শঙ্করী বলিল, "দেখ্‌বে এস বাবা।"

পিতার হাত ধরিয়া কন্যা ছুটিল, চূড়ামণি তাহার পশ্চাৎ যন্ত্রচালিতের ন্যায় চলিলেন। তারপর বাহিরে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহা বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন, দ্বার সম্মুখে একখানি অতি ক্ষুদ্র প্রতিমা, প্রতিমার গায়ে তখনও রং পড়ে নাই, শিল্পী কেবল মৃত্তিকার কার্য্য শেষ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু সে অবস্থাতেও সে প্রতিমা কি সুন্দর! বর্ণসংশ্লেষবিহীন ক্ষুদ্র প্রতিমার ক্ষুদ্র মুখখানি হইতে কি মধুর হাস্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে, সে হাস্যচ্ছটায় প্রভাত গগন সমুজ্জ্বল হইয়াছে, ভগ্ন দ্বারপ্রান্ত আলোকিত হইয়াছে, চূড়ামণির নৈরাশ্যতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আশার মধুর আলোক ছড়াইয়া দিতেছে। চূড়ামণির হৃদয় বিস্ময়ে বিহ্বল, ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি স্পষ্ট শুনিলেন, সেই ক্ষুদ্র প্রতিমা স্নিগ্ধ হাস্যে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া সুমধুর কণ্ঠে বলিতেছে, "চূড়ামণি, আমি এসেছি।"

চূড়ামণি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, ভক্তিগদগদ কণ্ঠে 'মা মা' শব্দে ডাকিতে ডাকিতে প্রতিমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন।

আমি যাহাকে শাসন করিতে চাই, সে যদি শাসিত হইয়া আমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া না পড়িল, তবে আমার শাসনের গৌরব কোথায়? মথুর বাবু ভাবিয়াছিলেন, জমি কাড়িয়া লইলেই চূড়ামণির গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, সে আসিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কিন্তু চূড়ামণি আসিলেন না। তখন গ্রাম হইতে—সমাজ হইতে তাঁহার সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, তথাপি গর্ব্বিত ব্রাহ্মণের উন্নত মস্তক অবনত হইল না। মথুর বাবু ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিলেন, চূড়ামণিকে শাসন করিতে গিয়া যেন তিনি নিজেই শাসিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু আর কোন উপায় নাই।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মথুর বাবু শেষে চূড়ামণিকে বিপন্ন করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি একখানি ছোট প্রতিমা গড়াইয়া পঞ্চমীর শেষ রাত্রিতে চূড়ামণির দ্বারপ্রান্তে রাখিয়া আসিলেন। দ্বারে প্রতিমা রাখিয়া আসিলেই তাহার পূজা করিতে হয়। কিন্তু যে খাইতে পায় না, সে পূজার ব্যয় কোথায় পাইবে? অগত্যা ব্রাহ্মণকে মথুর বাবুর দ্বারস্থ হইতে হইবে।

মথুরবাবু সূক্ষ্মবুদ্ধি হইলেও বুঝিতে পারিলেন না যে, ভক্তের পূজায় অর্থের আবশ্যকতা নাই; যেখানে ভক্তির যত অভাব, সেই খানেই অর্থের তত প্রয়োজন। লোকে অর্থ দ্বারা ভক্তির অভাবটা ঢাকিতে চেষ্টা করে।

(৫)

মথুরবাবুর বাটীতে সপ্তমীপূজা শেষে বলিদানের আয়োজন হইতেছে। সপ্তমীর দিনে দুই তিনটী মাত্র ছাগ বলি হয়। পূজক স্নাত সিন্দুরমণ্ডিত

ছাগ লইয়া দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছেন, ঘাতক আসিয়া খড়্গ হস্তে যথাস্থানে বসিয়াছে, দর্শকবৃন্দ বলির স্থান বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছে, মথুরবাবু কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীসম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। সহসা এক ছিন্নবেশা বিকৃতদর্শনা ভিখারিণী ছুটিয়া আসিয়া একেবারে মথুরবাবুর পাশে দাঁড়াইল ; এবং বিকটস্বরে বলিয়া উঠিল, "জমিদার বাবু, খেতে দাও, খেতে দাও।"

মথুরবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দুই পদ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, কয়েকজন লোক ছুটিয়া ভিখারিণীকে ধরিতে আসিল। ভিখারিণী মথুরবাবুর দিকে আরও সরিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমায় খেতে দাও জমিদার বাবু, আমায় খেতে দাও।"

ভিখারিণীর আচরণ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত ; কিন্তু ভিখারিণীর বিকট বদনে অট্টহাস্যের রেখা। মথুরবাবু ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এখনি রাক্ষসী মাগীকে বাড়ী হতে বের করে দে।"

আজ্ঞামাত্র আটদশজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ভিখারিণীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই ; সে বিকট অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, "তবে কি তোদের কেবল পাঁঠা কাটবার জন্যই পূজা ? একটা ভিখারিণীকে খেতে দেবার শক্তি তোদের নাই ? আমি তবে চূড়ামণির ঘরে যাই, সে আমায় খেতে দেবে।"

ভিখারিণী হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল ; তাহার বিকট হাস্যে সমগ্র পুরী যেন ঘোর ভূকম্পনে কাঁপিয়া উঠিল। তারপর মুহূর্ত্তে সেই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া ভিখারিণী অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলে ঘোর ভয়ে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মথুরবাবু একবার স্থির দৃষ্টিতে দেবীর মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে চূড়ামণির বাড়ীর দিকে

চলিলেন। পূজক উৎসৃষ্ট ছাগের স্কন্ধ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন; ঘাতক হাত হইতে খড়্গ নামাইল, ঢাকী কাঁধ হইতে ঢাক নামাইয়া রাখিল।

মথুরবাবু চূড়ামণির বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চূড়ামণি তখন পূজা শেষ করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিতেছেন। কিন্তু একি, চূড়ামণি কাহার পূজা করিতেছেন? প্রতিমার মধ্যস্থলে সে দশভুজা দেবীমূর্ত্তি কৈ? তাহার পরিবর্ত্তে সেখানে ও কে দাঁড়াইয়া? সেই ভিখারিণী—সেই ছিন্নভিন্নবেশা রুক্ষকুন্তলা ক্ষুধার্ত্তা ভিখারিণী দাঁড়াইয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে; আর তাহারই সম্মুখে বসিয়া চূড়ামণি ভক্তি-কণ্টকিত কলেবরে গদ্গদ কণ্ঠে পাঠ করিতেছেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

মথুরবাবুর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; তিনি যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে চূড়ামণির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "চূড়ামণি, চূড়ামণি!"

কিন্তু চূড়ামণির বুঝি তখন বাহ্যজ্ঞান নাই; তিনি ভক্তি-পুলকিত কণ্ঠে আপন মনে গাহিতেছিলেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

মথুরবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "চূড়ামণি, আমি তোমায় চিন্‌তে পারি নাই; আমি জানতাম না যে, ক্ষুদ্র ছাগও জগজ্জননীর সন্তান।···আমায় ক্ষমা কর চূড়ামণি, ক্ষমা কর।"

চূড়ামণি মথুরবাবুকে তুলিয়া লইয়া আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন. তার পর ভক্তিপ্লাবিত সমুচ্চকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন,—

"সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

মেয়ের বাপ

(১)

সে দিন প্রথম বসন্তের বাতাস বহিতেছিল। পথের পাশে গাছের মাথায় নূতন পাতার ভিতর বসিয়া একটা কোকিলও যে না ডাকিয়াছিল এমন নহে, কিন্তু প্রথম প্রিয়ালিঙ্গনের ন্যায় বসন্তের সেই প্রথম সুরভি শ্বাসস্পর্শেই প্রাণটা বেশী মাতিয়া উঠিয়াছিল। যে অমৃতময় স্পর্শে শুষ্ক-তরু মঞ্জরিত হয়, বনের পাখীর কণ্ঠে সঙ্গীতের সুধা-লহরী ছুটিতে থাকে, মহেশ্বরের ন্যায় মহাযোগীরও যোগভঙ্গ হয়, সে মধুর স্পর্শনে আমাদের মত সংসারসুখরত লোকের প্রাণ যে শিহরিয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি!

প্রাণের ভিতর এই নবীন উন্মাদনার ভাব লইয়া যখন ঘরে ঢুকিলাম, তখন সংসার-সাগরের একমাত্র সুখতরণী প্রিয়তমা আমার, একখানি সদ্যো-ধৌতবাসে বরবপু সমাবৃত করিয়া, চরণে অলক্তক এবং ললাটে একটী মনোমোহিনী টিপ পরিয়া যেন আমারই প্রতীক্ষায় গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবং বোধ হয় মনে মনে ডাকিতেছিলেন:—"এসো এসো বঁধূ এসো, আধ আঁচরে বসো—।"

আমি একেবারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বাম হস্তে তাঁহার দক্ষিণ অংস এবং দক্ষিণ হস্তে চিবুকটী ধরিয়া গাহিলাম,—"আজি লো সজনি প্রেমের তরঙ্গে—।"

চিবুক হইতে হাতটা সরাইয়া দিয়া প্রিয়তমা সহাস্যে বলিলেন, "রঙ্গ দেখে বাঁচি না! ব্যাপার কি?"

আমি যাত্রার সুরের অনুকরণ করিয়া বলিলাম,—"অয়ি প্রিয়তমে, অয়ি আমার সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার স্বর্ণ কলস, দেখিতেছ না, আজি প্রেমিকজন-মনোহর সুমধুর বসন্ত-সমীরণ প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়-সরসীতে মিলনানন্দের মধুর তরঙ্গ তুলিয়া —।"

বাধা দিয়া প্রিয়তমা বলিলেন, "আজ বুঝি আফিসে কিছু খাওয়া হয়েছে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এমন বেশী কিছু না। সাহেবের কাছে সামান্য জলযোগ হয়েছে মাত্র। কিন্তু তাতে তো তৃপ্তি হয় নাই। তাই বসন্তের এই নবীন সন্ধ্যায় আমার তৃষিত হৃদয়-চকোর তোমার ঐ অধর-শশধরের—"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া প্রিয়া বলিলেন "যত বয়স হচ্চে তত রঙ্গ বাড়ছে; যাও।"

প্রিয়ার নীরস প্রত্যাখ্যানে একান্ত ব্যথিত হইয়া, একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘ-শ্বাসে হতাশ হৃদয়ের সুগভীর ব্যথা ব্যক্ত করিয়া বলিলাম "তবে যাই।"

"কোথায়?"

"কোথায়? এমন বসন্তসমাগমপ্রফুল্ল সন্ধ্যায় প্রেমিকের উন্মাদ হৃদয় যথায় শান্তিলাভ করে, সেই 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়-সমীরে, মধুকরনিকরকরম্বিত কোকিলকূজিত—"

কবিত্বরসবোধবিহীনা প্রিয়তমা আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "চুপ, ঠাকুর ঝি আসছে।"

বাহির হইতে দিদি ডাকিলেন, "হরেন এসেছিস্?"

"এসেছি দিদি।"

"ঘটকী ঠাকরুণ এসে বসে আছে। ছ'টার সময় যাবার কথা ছিল।"

মুহূর্ত্তে বসন্তের মাধুর্য্য, কবিত্বের উচ্ছ্বাস কোথায় উধাও হইয়া গেল। ঘড়ি দেখিলাম—সাড়ে ছয়টা।

"আচ্ছা, এখনি যাচ্চি।"

গৃহিণী বলিলেন, "মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খেয়ে গেলে হ'ত না?"

"ফিরে এসে সে ব্যবস্থা করা যাবে" বলিয়া আফিসের পোষাকেই বাহির হইলাম। আমার সঙ্গে চলিলেন, কন্যাদায়-তরণীর একমাত্র কর্ণধার শ্রীমতী ঘটকী ঠাকুরাণী (কর্ণধার শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে কর্ণধারী হওয়া উচিত, কিন্তু এমন সরস বসন্তে কর্ণধারী লিখিয়া ভাষাটাকে নীরস করিয়া আপনার লম্বকর্ণের পরিচয় দিতে পারিলাম না; বৈয়াকরণিক পাঠক মার্জ্জনা করিবেন)।

(২)

সাড়ে চারিকাঠা জমির উপর একখানি দিব্য দ্বিতল অট্টালিকা। বাহিরে (সেটী বাহির কি অন্দর স্থির করা কঠিন) একখানি ক্ষুদ্র গৃহ দশ আনা মূল্যের ল্যাম্পের আলোকে আলোকিত। গৃহমধ্যে সেই গৃহেরই উপযুক্ত একখানি ক্ষুদ্র তক্তাপোষ, তাহাতে একখানি সতরঞ্চি পাতা। দেওয়ালে মেলিন্স্ ফুডের এ্যালম্যানাক, ব্র্যাকেটে একটী আড়াই টাকা দামের টাইম্‌পিস্। তক্তাপোষের উপর বরের পিতা অথবা কন্যাদায়গ্রস্তের অদৃষ্টবিধাতা, গবর্ণমেণ্টের পঁচিশ টাকা পেন্‌সন-ভোগী শ্রীযুক্ত রামবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী পাঁচসিকা মূল্যের গড়গড়ায় দশ পয়সা দামের নল লাগাইয়া চারি আনা সেরের বালাখানার তামাকের সুগন্ধি ধূম উদ্গিরণ করিয়া তাম্রকূটসেবিগণের লোভ উৎপাদন করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে একটী বড় রকমের নমস্কার করিয়া এবং মৃদুহাস্য সংযুক্ত একটী ক্ষুদ্র নমস্কার লইয়া তক্তাপোষের একপার্শ্বে স্থানগ্রহণ করিলাম।

তারপর ছেলে-দেখার পালা। ছেলে মন্দ নয়, কলিকাতার ছেলে যেমন হয় তেমনই। পরণে চওড়া কালাপাড় ধুতি (প্রাচীনকালে উহাকে শাড়ী বলিত), গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে আলবার্ট সু, মাথায় টেড়ী; কেবল মুখে বিড়ী বা সিগারেট ছিল না।

ছেলেটীর নাম সুরেশচন্দ্র। সে সম্প্রতি বি এ পরীক্ষা দিয়াছে। পরীক্ষার ফল বাহির হইতে এখনও দুই মাস বিলম্ব। পিতা ইহার মধ্যেই ছেলের বিবাহ কার্য্যটা শেষ করিয়া লইতে চান। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে পাশের তালিকায় যদি ছেলের নাম না থাকে, তবে দর কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় তাড়াতাড়ি।

ছেলে-দেখার পর দরদস্তুর। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে অনেক ভূমিকা করিলেন। যথা—তাঁহার এখন মোটেই ছেলের বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল গৃহিণীর অনুরোধেই এত তাড়াতাড়ি। নতুবা পাশের ফলটা বাহির হইলে পানাপুকুরের উকীল নিশ্চিন্তবাবুর নিকট নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাইত, ইত্যাদি। এরূপ ভূমিকা অনেক মেয়ের বাপই শুনিয়া থাকেন। তারপর দরের কথা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় গড়গড়ার নলে একটা জোর টান দিয়া একদমে তিন হাজার টাকা হাঁকিয়া বসিলেন। তাঁহার এই 'বড় বাজারী' দর শুনিয়া পঞ্চত্রিংশৎ-মুদ্রা বেতনভোগী কেরাণীর দুর্ব্বল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াটা যে সহসা স্থগিত হইয়া যাইতে পারে, ইহা বোধ হয় তাঁহার বিবেচনার মধ্যেই আসিল না। কোন্ বরের বাপই বা সে বিবেচনা করে?

ঘটক-ঠাকুরাণী দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি দন্তরুচি-কৌমুদীর বিকাশ করিয়া বলিলেন, "দেখলেন বাবু, আমি তো আগেই ব'লে ছিলাম, খুব কমেই হবে। ছেলে তো নয়, যেন হীরের টুক্‌রো। কেবল আপনার মেয়েটী দেখে পছন্দ হ'য়েছে বলেই…।"

ঘটকীর বক্তৃতা-স্রোতে বাধা দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহাস্যবদনে বলিলেন, "কি জানেন, মেয়েটী ভাল হলেই হলো। টাকায় কি আসে যায়? টাকা তো হাতের ময়লা; এই বয়সে কত টাকা রোজগার করলাম, কত টাকা খরচ করলাম। তারা! ব্রহ্মসনাতনী মা! ও ঝি, আর একটা কল্কে দিয়ে যাও।"

তারপর তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে বাজারের চাউলের দর, গয়লার জলো দুধ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ, পার্লামেণ্টে ভারতের কথা, প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গেরই আলোচনা হইল। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। আমি ঘটকীর মুখে সংবাদ দিবার আশা দিয়া, আর একটী নমস্কার করিয়া এক প্রকার নিরাশচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিলাম।

তখন আর বসন্তের বাতাসে তেমন মিষ্টতা ছিল না, গরম বোধ হওয়ায় কামিজের বোতাম খুলিয়া দিলাম।

(৩)

দিদি বলিলেন, "আর দেখা-দেখিতে কাজ নাই, ঐ খানেই ঠিক করে ফেল।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "বল কি দিদি, তিন হাজার যে?"

দিদি। তিন হাজার ব'লেছে ব'লেই কি তাই হবে?

আমি। কত আর কম্‌বে, দু'হাজারের নীচে তো যাবে না। তার সঙ্গে ধর, আরও পাঁচ সাত শো।

দিদি। তেমনি ছেলের যে তিন তিনটে পাশ, দু'খানা ভাড়াটে বাড়ীও আছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কিন্তু আমার এই বাড়ীটুকু যে যাবার যোগাড় হ'য়েছে।"

দিদি। এত টিপ্ টিপ্ করলে কি মেয়ে পার হয়!

আমি। পার হয় কি না দেখব। আসছে মাসে দিনকয়েক ছুটী নিয়ে একবার পাড়া গাঁ অঞ্চলে খোঁজ করব।

দিদি যেন একটু রাগত ভাবে বলিলেন, "যা ভাল বোঝ তাই কর, কিন্তু মনে থাকে যেন, মেয়ে শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে বারয় পা দিয়েছে।"

দিদি উঠিয়া গেলেন। এবার গৃহিণী আসর জমকাইবার অবসর পাইলেন। তিনি প্রথমেই পঞ্চমে স্বর ধরিয়া বলিলেন, "পাড়া গাঁয়ে যাবে? পাড়াগাঁয়ে মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দেব না।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "দোষ কি? তুমি কোথা হ'তে এসেছ?"

আমি জানিতাম, পাড়াগেঁয়ে বলিলেই গৃহিণী চটিয়া যাইতেন; তাঁহাকে রাগানই এখন আমার উদ্দেশ্য। আমার সে উদ্দেশ্য সফল হইল। গৃহিণী আহতা ফণিনীর ন্যায় ফোঁস করিয়া উঠিলেন। কুঞ্চিত নাসাগ্রে নথচক্রটা সবেগে দুলিয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে সে চক্রটা বৈজ্ঞানিকের ক্রমোন্নতিবাদ নিয়মের বশীভূত না হইয়া ক্রমাবনতির পন্থানুসরণ করিয়াছে; অর্থাৎ এই সার্ব্বজনীন উন্নতির যুগে সে আপনার বৃহত্ত্ব ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের বিনয়ের ন্যায় ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম আকৃতি ধারণ করিতেছে। সুতরাং তাহার এই আন্দোলনে সবিশেষ ভীত না হইয়া বরং একটু মৃদু হাস্য করিলাম।

গৃহিণী আরও রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমি পাড়া গাঁ হ'তে এসেছি ব'লে কি মেয়েটাকে ম্যালেরিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে?"

আমি। ম্যালেরিয়ার হাতে তুলে দেব না; একটী বেশ সুপাত্র দেখে তারই হাতে তুলে দেব।

গৃহিণী। পাড়াগাঁয়ে আবার সুপাত্র! আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "দুঃখের বিষয় প্রিয়তমে, লোকে না বুঝিয়া মেয়েটাকে আমারও বলিয়া থাকে।"

শ্লেষের তীব্র শরে জর্জ্জরিত হইয়া গৃহিণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রোষ-সংক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ। আমার পোড়া কপাল, তাই তোমার সঙ্গে কথা কহিতে আসি!"

ঝড় অপেক্ষাও দ্রুতবেগে গৃহিণী আমার সান্নিধ্য ত্যাগ করিলেন।

গৃহিণীর কপালটা যে পোড়া, ইহা তিনি সপ্তপদীর পর হইতেই বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং সময়ে অসময়ে আমাকেও বুঝাইয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাঁহার অদ্যকার এই আক্ষেপে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হইলাম না, বরং একটু চিন্তা করিবার অবসর পাইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

নিরুপমা আসিয়া পাশে বসিল, এবং হাতখানি ধরিয়া তাহার ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়া আমার আঙ্গুলগুলি নাড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম, "কি নিরু?"

নিরু বলিল, "রাত হ'লো যে বাবা, কখন্ আহ্নিক করবে, কখন্ জল খাবে?"

বালিকার এই স্নেহপূর্ণ আহ্বানে আমার প্রাণটা যেন গলিয়া গেল। কৈ, আর কেহ তো এ কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে আসে নাই! আমার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। বলিলাম, "এই যাই মা।"

নিরু তাহার ভাসা ভাসা চোখ দুইটা আমার মুখের উপর রাখিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল, "কত ভাববে বাবা?"

কত ভাবিব? এ ভাবনার বুঝি অন্ত নাই। কিন্তু মুখে একটু হাসি

দেখাইয়া বলিলাম, "ভাবনা কিসের নিরু ? কেবল তোকে একটু ভাল ঘরে দিবার জন্যই যা একটু ভাবনা।"

নিরু উঠিয়া দাঁড়াইল ; আমার হাত টানিয়া বলিল, "এখন উঠে এস, সেই কখন ন'টার সময় খেয়ে গেছ।"

গৃহিণীর সহিত বিবাদ বাধিলেও শেষে তাঁহারই জয় হইল। বাড়ী-খানি বাঁধা দিয়া, রামবল্লভ বাবুকে নগদ বারশত টাকা, মেয়েকে সাতশত টাকার অলঙ্কার, এবং জামাতাকে যোড়শোপচার অর্থাৎ চরণের পাদুকা হইতে ধূমপানের সিগারেট কেসটী পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া বিষম কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইলাম। গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটিল।

গৃহিণীর এ জয়লাভটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শিখণ্ডীর পশ্চাতে থাকিয়া অর্জ্জুনের জয় লাভের মত। আসল কথা, সংসারে যদি কিছু আমার ভাল-বাসার জিনিস থাকে তবে সে নীরু। সেই ক্ষুদ্র বালিকা কিরূপে যে স্নেহের সুকোমল আকর্ষণে আমাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা আমিই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। নিরুকে সুখী করিবার জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, বাড়ী বাঁধা কোন্ ছার !

অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, সুরেশের স্বভাব চরিত্র খুব ভাল, তাহার উপর বিএ পাশ—উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। ভাড়াটে বাড়ী লইয়া কলিকাতায় তিনখানি বাড়ী। এমন ঘরে মেয়ে যদি সুখী না হয়, তবে আর কোথায় হইবে ? তাই গৃহিণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম, হাসিতে হাসিতে বাড়ী বাঁধা দিলাম। ভাবিলাম, আমার যাহা হয় হউক, মেয়ের বিয়েতে! নিশ্চিন্ত হইলাম।

(৪)

বিবাহের আটদিন পরে মেয়ে আনিতে গেলাম, কিন্তু মেয়ে পাঠাইল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বৈবাহিকা মহোদয়া বহু তর্জ্জন গর্জ্জন ও

অনুশোচনা সহকারে যে উত্তর করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—জামাতাকে সাড়ে সাত ভরি সোণার চেন দিবার কথা ছিল, কিন্তু আড়াই ভরির মাত্র চেন দেওয়া হইয়াছে, তাহাও ১৮৲ টাকা দরের মরা সোণা। সুতরাং আমি যে দিনে ডাকাতি করিতে পারি এবিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডাকাতি করি আর নাই করি, কখন্ যে সাড়ে সাত ভরির চেন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা কিছুতে স্মৃতিপথে আনিতে পারিলাম না। বাল্যকাল হইতে স্মৃতিশক্তিশালী বলিয়া যে আমার খ্যাতি ছিল, বুঝিলাম, বিষম কন্যাদায়ের চাপে সে শক্তিটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমার মনে থাক্ বা না থাক্, যখন বৈবাহিক বা বৈবাহিকার মনে আছে, তখন কথাটা মিথ্যা হইতে পারে না, এবং সে জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী। এদিকে এখন আমাকে বিক্রয় করিলেও সাত ভরি সোণার দাম পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু গাত্রে কোন অস্পৃশ্য বস্তু লেপন করিলেও যম ছাড়িবার পাত্র নহে।

মেয়ে পাঠাইবে না শুনিয়া গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "যদি মেয়ে না পাঠায়, আমি বিষ খাব।"

আমি মনে মনে বলিলাম, "ও জিনিষটা খাওয়া এখন আমারই অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।"

কিন্তু আমি বিষ খাইলেতো বরের মাতাপিতার ঋণ শোধ হইবে না! অগত্যা এ সঙ্কল্পটাকে আপাততঃ মনোমধ্যেই রাখিয়া দিলাম। বন্ধু বিনোদকে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া একশত টাকা লইলাম, এবং সেই টাকা বৈবাহিকার চরণোপান্তে উপহার প্রদান করিয়া অনেক সাধ্য-সাধনার পর মেয়েকে লইয়া আসিলাম।

একমাস পরে বি এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। পাশের তালিকাটা

পাঁচ সাতবার আদ্যন্ত পড়িয়াও তাহার মধ্যে সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম খুঁজিয়া পাইলাম না।

গৃহিণী আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার জামাতা বি, এ পাশ করিয়া একজন নামজাদা উকীল, অন্ততঃ একটা ডেপুটিও হইবে। কিন্তু হায়! তাঁহার আশা-লতায় জলসেচনই সার হইল, তাহাতে ফুল ফুটিলেও ফল ধরিল না, পরীক্ষকরূপ দুষ্ট কীটের দংশনে ফুলটি অকালে ঝরিয়া পড়িল। পরিশেষে জামাতা বাবাজী যখন আমাদেরই পাঁচ জনের মত কেরাণী-গিরির উমেদার হইলেন, এবং ৯টার মধ্যে ভাতে ভাত করিয়া দিবার জন্য মেয়ের উপর তাড়া পড়িবার সম্ভাবনা হইল, তখন গৃহিণীর আক্ষেপের সীমা রহিল না; তিনি নূতন করিয়া তাঁহার পোড়াকপালটার কথা কয়েকবার শুনাইয়া দিয়া তবে নিরস্ত হইলেন।

গৃহিণী নিরস্ত হইলেও আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একে তো আমারই কন্যার জন্মকালীন অশুভ লগ্নাধিপতিটা পরীক্ষকের স্কন্ধে ভর করিয়া জামাতাকে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য করিয়া দিল এবং নিরুপমাকে সাতিশয় অলক্ষণা বলিয়া প্রচার করিল। তাহার উপর যদি একটা চাকরীও না জুটে, তাহা হইলে বৈবাহিকার তীব্র অনলোদগারে কন্যার সহিত যে আমাকেও ভস্মীভূত হইতে হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অগত্যা বড় সাহেবকে ধরিয়া বসিলাম। জানি না, পূর্ব্বজন্মের কোন সুকৃতিবলে সাহেব আমাকে একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিতেন। সুতরাং আমার প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না, সুরেশের চাকরী হইল।

বাবাজীর গাত্র হইতে তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ধ দূরীভূত হয় নাই, সুতরাং প্রথম প্রথম তিনি আফিসে বসিয়া নীতি, বিবেক, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি লইয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়িতে লাগিলেন। পরিশেষে আমি যখন

তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, এটা সেনেট হাউস নয়, ইহা সম্পূর্ণ সওদাগরী আফিস; এখানে নীতিপাঠের কিছুমাত্র চর্চ্চা হয় না, তৎপরিবর্ত্তে কাক কড়া ক্রান্তির তন্ন তন্ন করিয়া হিসাব হয়; এই হিসাবেই এখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ, সাহেবের প্রসন্নতাতেই তাহার স্ফূর্ত্তি, এবং বেতনবৃদ্ধিই উহার চরম পরিণতি। তখন বাবাজী কতকটা শান্ত হইলেন।

সুরেশকে নিজের কাছে রাখিয়া ক্যাসের কাজ শিখাইতে লাগিলাম। বেতন আপাততঃ ২৫৲ ধার্য্য হইল।

কয়েক মাস পরে সাহেব সুরেশের কাজ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দশ টাকা বেতন বৃদ্ধির সহিত আমার সহকারী কেসিয়ার রূপে নিযুক্ত করিলেন, জামাতার পদোন্নতিতে গৃহিণী নগদ পাঁচ সিকা খরচ করিয়া সত্যনারায়ণের সিন্নী দিলেন।

(৫)

সে দিন সুরেশ আফিসে আসে নাই। কেন আসিল না, তাহার নিজের অথবা বাড়ীর কাহারও অসুখ হইল কি না ভাবিতে ভাবিতে কাজ করিতেছিলাম, এমন সময় বড় সাহেব টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। কাল ৫টার পর বারন্ কোম্পানীর নিকট হইতে বিলের বার শত টাকা আসিয়াছিল। ব্যাঙ্কে জমা দিবার সময় অতীত হওয়ায় তাহা সিন্দুকেই রাখা হইয়াছিল। সুরেশ টাকা তুলিয়া রাখিয়া চাবী আমাকে দেয়। আজি ব্যাঙ্কে পাঠাইবার জন্য সাহেব সেই টাকা চাহিতেছেন।

আমি উঠিয়া সিন্দুক খুলিলাম। সিন্দুক খুলিতেই আমার চক্ষুস্থির! টাকা কোথায়? আমার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে সিন্দুকের সর্ব্বত্র তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু টাকা পাইলাম না। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

আরদালী আসিয়া সাহেবের জরুরি তলব জানাইল। আমি সিন্দুক বন্ধ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের ঘরে ঢুকিলাম। সাহেব লিখিতে-ছিলেন; লিখিতে লিখিতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "হরেন বাবু, কাল যে বারনকোম্পানীর বিলের টাকা"—সহসা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একি বাবু? কি হইয়াছে?"

আমি মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, "টাকা নাই!"

"টাকা নাই!" সাহেব সবলে টেবিলের উপর চপেটাঘাত করিয়া বজ্রগম্ভীরনাদে বলিয়া উঠিলেন, "টাকা নাই!"

আমি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ নীরবেই কাটিল। তারপর সাহেব ক্রোধ একটু সংবরণ করিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যাসের চাবী কাহার নিকট ছিল?"

আমি। আমার কাছে।

সাহেব। তাহা হইলে অবশ্য তুমি বলিতে পারিবে না যে চোরে ইহা চুরি করিয়াছে?

আমি। কেমন করিয়া বলিব সাহেব?

সাহেব। উত্তম, টাকা কে রাখিয়াছিল?

আমি। সুরেশ।

আরদালীর দিকে চাহিয়া সাহেব বলিলেন, "সুরেশ বাবুকে বোলাও!"

আমি। সুরেশ আজ আসে নাই।

সাহেব। আসে নাই? ওঃ গড্, আর বোধ হয় আসিবেও না। তুমি জল্দি যাও, সুরেশের সন্ধান কর। তুমি ফিরিলে পুলিসে সংবাদ দিব।

আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে সুরেশের বাটীর দিকে ছুটিলাম।

নিরুপমা রন্ধনশালায় ছিল, আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং আশ্চর্য্য হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "একি, বাবা যে!"

আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম, "সুরেশ—সুরেশ কোথায়?"

নিরুপমা শিহরিয়া উঠিল; ব্যগ্রদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হয়েছে বাবা?"

তাহার স্বর উৎকণ্ঠাপূর্ণ। আমি বলিলাম, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, আফিসের টাকা ভেঙ্গেছে।"

নিরু কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কোথায়?"

মুখে আঁচল চাপিয়া ধরা ধরা গলায় নিরু উত্তর করিল, "কাল সেই আফিসে গেছে, তারপর—তারপর আর ফেরেনি।"

"ফেরেনি? গেল কোথায়? এমন কি আর কখনও হয়?"

নিরু কোন উত্তর করিল না, কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, হতভাগ্য যুবক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। হায় উচ্চশিক্ষা!

এখন আমার অনেক কথাই মনে পড়িতে লাগিল। একদিন একটা জঘন্য বাড়ীর বারান্দায় কয়েকজন যুবকের সহিত যেন সুরেশকে দেখিয়াছিলাম। আর একদিন যেন মদের দোকান হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু তখন ভাবিয়াছিলাম যে, উহা আমার দেখিবার বা শুনিবার ভ্রম! কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, উহা ভ্রম নয়, অতি প্রকৃত ঘটনা।

যাহা হউক, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজনবোধে প্রস্থানের উপক্রম করিলাম। সহসা নিরু দুই হাত আমার পায়ের উপর রাখিয়া আকুলকণ্ঠে বলিল, "কি হবে বাবা ?"

তাহার সেই আকুল দৃষ্টিতে যেন কত নীরব প্রার্থনা, কাতর দৃষ্টিতে যেন কত অনুরোধ। আমি আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, "ভয় নাই নিরু, যেমন করে হোক সুরেশকে বাঁচাব।"

নিরুপমা আমার পা ছাড়িয়া দিল। এমন সময়ে গৃহিণী,—নিরুর শাশুড়ী ঠাকুরাণী উপরের বারান্দা হইতে আধতর্জ্জন আধক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে বাবারে, কি জোচ্চোরের আফিস রে? আমার দুধের বাছা যে কিছুই জানে না রে!"

ইচ্ছা হইল, এই নির্লজ্জাকে বেশ দুই চারি কথা শুনাইয়া দিই। কিন্তু আর একবার মেয়ের মুখের দিকে চাহিতেই আমাকে সে ইচ্ছা দমন করিতে হইল, আমি বাটী হইতে ছুটিয়া বাহির হইলাম।

(৬)

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল বাবু?"

আমি বলিলাম, "সাহেব, সুরেশের কোন অপরাধ নাই, আমিই ক্যাস ভেঙ্গেছি, আমায় পুলিসে দিন।"

সাহেব একটু হাসিলেন; বলিলেন, "হরেন বাবু, তুমি আমাকে এতই নির্ব্বোধ মনে কর?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সাহেব বলিলেন, "আমরা কিন্তু বাবু, এমন অবস্থায় জামাইকেও ক্ষমা করিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "আমিও জামাইকে ক্ষমা করি নাই সাহেব, ক্ষমা করেছি মেয়েকে।"

সাহেব বসিয়া বসিয়া একটু ভাবিলেন। তারপর ধীরগম্ভীর স্বরে

বলিলেন, "হরেন বাবু, তুমি পুরাতন লোক। আমি পুলিস হাঙ্গামা করিতে চাহি না। সাত দিনের সময় দিলাম, ইহার মধ্যে টাকাটা আফিসে জমা দিবে।"

আমি। আমাকে বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দিবেন?

সাহেব। সে বিশ্বাস না থাকিলে জামিন না লইয়া তোমার হাতে ক্যাস দিতাম না বাবু।

সাহেবের উদারতা দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। সাহেব বলিলেন, "যাও বাবু, ঈশ্বর তোমার সহায় হউন। যাহাতে তোমার চাকুরী না যায়, সে জন্য আমি চেষ্টা করিব।"

সাহেবকে সেলাম করিয়া বিদায় লইলাম।

সুরেশের পিতার নিকট গিয়া সকল কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস হয় না যে সুরেশ চুরি ক'রেছে। যদিই ক'রে থাকে, জেলে দাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

আমারও ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না. কিন্তু মেয়েটা মাঝে থাকিয়াই সকল গোল বাধাইয়াছে।

ভদ্রাসনটী পূর্ব্বেই বাধা পড়িয়াছিল। এক্ষণে বিক্রয় কোবালা দ্বারা সেটাকে মহাজনের সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া দিয়া যাহা পাইলাম, তাহাতে আফিসের দেনা শোধ করিলাম। তারপর একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে উঠিয়া গেলাম।

এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া একদিন অপরাহ্ণে নিরুকে দেখিতে এবং সেই সঙ্গে সুরেশের সংবাদ লইতে চলিলাম।

(৭)

সে দিনও ফাল্গুনের শেষে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল। রাস্তার পাশের বাড়ীর বারান্দায় খাঁচার ভিতর হইতে একটা কোকিল থাকিয়া

থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল, দূর হইতে আর একটা কোকিল তাহার ডাকের উত্তর দিতেছিল।

যে রাস্তায় সুরেশদের বাড়ী, তাহার মোড় ফিরিতেই উহাদের বাড়ীর ঝিকে দেখিতে পাইলাম। আমাকে দেখিয়া ঝি যেন থমকিয়া দাড়াইল। আমি তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "সব ভাল তো ঝি?"

ঝি বলিল, "আমি আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম।"

আমি। কেন?

ঝি। বৌদিদির বড় অসুখ।

আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কার? নিরুপমার? কি অসুখ?"

ঝি কোন উত্তর করিল না, রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। আমি সন্দেহে—আশঙ্কায় অস্থির হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি অসুখ ঝি?"

ঝি এবার যেন কষ্টে উত্তর করিল; বলিল, "অসুখ—কি আর বলব বাবু, আমরা গরীব লোক।"

আমি স্থান কাল পাত্র সব ভুলিয়া গেলাম; উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া ঝির হাত দুইটা চাপিয়া ধরিলাম; বলিলাম, "সত্য বল ঝি কি হয়েছে।"

ঝি হাত সরাইয়া লইয়া চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি আর বলব বাবু, ক'দিন তো দাদাবাবু ঘরে আসেন নি। তারপর কাল হঠাৎ রাত্রে ঘরে এলেন। এসেই বৌদিদিকে গয়না চান। বৌদিদি বুঝি তা দিতে চায় নি, না কি বলেছিল, এই আর কি, নেশার ঝোঁকে এমন মার মেরেছে—"

"এঁ্যা মেরেছে? আমার নিরুকে মেরেছে?"

"মার ধরটা ইদানীং প্রায়ই চল্‌তো, তবে কাল যেমন হ'য়েছে, এমনটা একদিনও হয় নি।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কেমন আছে?"

ঝি। নিঃশ্বাসটুকু আছে, জ্ঞান নাই। এক একবার যখন জ্ঞান হচ্ছে, তখন কেবল 'বাবা গো' 'বাবা গো' ব'লে ডাকছে। ডাক্তার ব'লেছে, আজকের রাতটা কাটলে হয়।"

আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, কাঁপিতে কাঁপিতে রাস্তার উপর বসিয়া পড়িলাম।

বসন্তের বাতাস হু হু করিয়া মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে দূর হইতে একটা ক্ষীণকণ্ঠের ব্যথিত স্বর ভাসিয়া আসিয়া কাণে বাজিতে লাগিল, "বাবাগো! বাবাগো!"

বন্ধন-মোচন

(১)

শেষ বয়সে আবার বিবাহ করিয়া শিরোমণি মহাশয় বড় গোলযোগে পড়িলেন। এ বয়সে কোথায় তিনি 'হরিহে, ভববন্ধন মোচন কর' বলিয়া সর্ব্বদা হরির নিকট সংসারের শেষ বন্ধনটা হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন. কিন্তু হরি সহসা কোথা হইতে আবার একটা নূতন বন্ধন আনিয়া তাঁহাকে জীর্ণ সংসার-খুঁটীর সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিলেন। যখন তিনি সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ভাবিতে ভাবিতে চিরপরিচিত সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময়—জীবনের সেই আলোক-অন্ধকার-মিশ্রিত উদাস সন্ধ্যাকালে সংসারটা আবার তাঁহাকে কোমল বন্ধনে জড়াইয়া ধরিল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শিরোমণি মহাশয় ভাবিলেন, 'হরিহে, সকলই তোমার ইচ্ছা!'

তা' ইচ্ছাটা যে সম্পূর্ণ হরির, এ কথা ঠিক্। কেননা তিনি নিজের ইচ্ছায় এ কাজটা করেন নাই। কেবল কুলীনের কুলরক্ষার জন্য, অধিকন্তু রামধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নরক-ভীতি নিবারণের অভিপ্রায়েই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এমন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। আর এরূপ মহৎকার্য্য তাঁহার এই নূতন নহে। তিনি জীবনে এরূপ ত্রয়োবিংশতিটি পরোপকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া

কুলীনসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কিন্তু এবারের মত অনুতাপ আর কখনও হয় নাই। আগে যাহা করিয়াছেন, তাহা তেমন দোষের নহে। কিন্তু এখন—এই সপ্ততিতম বর্ষ বয়সে তিনি বেশ বুঝিয়াছেন, "নলিনী-দলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।" এখন যে আর সময় নাই, মহাকালের পুরাতন খাতায় তাঁহার কাজের হিসাব নিকাশ চলিতেছে। জমা খরচ মিলাইয়া বাকী কাটিলেই হয়,—ডাক্ পড়ে পড়ে। এমন সময় একটী ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরীর পাণিগ্রহণ এবং অচিরেই তাঁহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও একাদশীর মধ্যে ফেলিয়া সংসার হইতে চির অবসর গ্রহণ—কাজটা কি ভাল হইয়াছে ?

কাজটা যে ভাল হয় নাই, তাহা শিরোমণিও জানেন। কিন্তু কি করিবেন, কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কার্য্য এবং ধর্ম্ম। সুতরাং এই ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত এ বয়সেও কাসকুসুম-শুভ্র কেশবিরল মস্তকে টোপর পরিয়া আবার তাঁহাকে বর সাজিতে হইল। সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা !

তা' ইচ্ছাময়ের শুভ ইচ্ছাটার এই খানেই যদি পরিসমাপ্তি হইত, তাহা হইলেও বিশেষ কোন কথা ছিল না। কিন্তু তাহা হইল না। বিবাহান্তে শিরোমণি মহাশয় যখন নববধূর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহযাত্রার উপক্রম করিলেন, তখন নববধূও তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। শিরোমণি ইহাতে অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন আপত্তিই টিকিল না। নববধূ তাঁহার পা দু'টী জড়াইয়া বলিল, "আমি তোমার সেবা করিব।" অগত্যা শিরোমণি মহাশয় বাধ্য হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। সেকালে এ কাজটা কুলীনের পক্ষে নিতান্ত বিগর্হিত হইলেও নববধূর নবযৌবন-প্রফুল্ল সুন্দর মুখখানা, আর সেই মুখের উপর অশ্রুভারাবনত ভাসা ভাসা চোখদু'টা তাঁহাকে

এমন অসঙ্গত কাজটাও করাইয়া ফেলিল। সে মুখের একটা ছাপ বুঝি তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ জীর্ণ হৃদয়ের এক কোণে পড়িয়াছিল।

তারপর সেই সুন্দরী যুবতী পত্নীর ভক্তিপূর্ণ সেবা, গৃহকর্ম্মনিপুণতা প্রভৃতি দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, রূপে গুণে লক্ষ্মী তরুণী পত্নীকে দেখিযা দেখিয়া তিনি পরিত্যক্তপ্রায় সংসারটাকে আবার জড়াইয়া ধরিলেন; তাঁহার শুষ্কপ্রায় হৃদয়-নদীতে আবার যেন একটু একটু করিয়া যৌবনের জোয়ার আসিতে লাগিল। তবে যখন প্রতিবাসী বাল্যবন্ধু হারু চক্রবর্ত্তীর বালিকা পৌত্রীটী কাছে বসিয়া তাঁহার পাকা চুল তুলিতে তুলিতে বলিত, "ঠাকুদ্দা মশায়, এযে সবই সাদা!" তখন শিরোমণি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন,—"হরি হে, ভববন্ধন-মোচন কর।"

(২)

শিরোমণি মহাশয়ের নবপরিণীতা পত্নীর নাম হরসুন্দরী। হরি হরি! সব মাটি! ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরী নায়িকার নাম হরসুন্দরী? এমন গল্পও লেখে? নাম কি আর সংসারে নাই? বাস্তবিকই তখন অন্য নাম সংসারে ছিল না। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখনও মৃণালিনী, তিলোত্তমা, সরোজিনী প্রভৃতি শ্রুতিমধুর নামের আবিষ্কারকগণ মাতৃ-জঠরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সুতরাং হে বিংশশতাব্দীর সুসভ্য পাঠক-সমাজ! আপনাদের বিরাগাশঙ্কায় ইতিহাসের উপর কলম চালাইতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম।

তা' নামটী যাহার হরসুন্দরী, সে যে কখনও স্নিগ্ধ চন্দ্রিকালোকে বসিয়া কোকিলের গান, ভ্রমরের গুঞ্জন শুনিবে, অথবা মলয়ানিলের সহিত আপনার গভীর তপ্তশ্বাস মিশাইবে, ইহা হইতেই পারে না! এমন নায়িকোচিত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম হরসুন্দরী কখনও করে নাই। কাজের

মধ্যে সে ভাত রাঁধে, গোসেবা করে, গৃহকর্ম্ম দেখে, বৃদ্ধ পতির চরণামৃত খায়। আর মাঝে মাঝে বসিয়া স্বামীর নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনে। শিরোমণি মহাশয় পত্নীর কার্য্যকলাপ দেখেন, আর মনে মনে বলেন, "হরি হে, সকলই তোমার ইচ্ছা!"

শিরোমণি মহাশয়ের বিবাহের তালিকাটা সুদীর্ঘ হইলেও এ পর্য্যন্ত তিনি প্রথম পক্ষের স্ত্রী ব্যতীত আর কাহাকেও গৃহিণী পদের অধিকার প্রদান করেন নাই। অবশিষ্ট পত্নীগুলিকে কেবলমাত্র বিবাহের সময় একবার দর্শন দিয়াই তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তার পর আর কাহারও সংবাদ লইবার অবসর বা প্রবৃত্তি ঘটিয়া উঠে নাই। কেবল একবার বীরসিংহপুরে এক পুত্রের উপনয়ন সংবাদ পাইয়া তথায় গিয়াছিলেন। আরও দুই এক স্থান হইতে পুত্রের অন্নপ্রাশনের সংবাদ আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি যাইতে পারেন নাই। পাড়ার সিধু ঘোষ তাহার এই অদ্ভুত পুত্রোৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া একদিন তাহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় শিরোমণি মহাশয় অসঙ্কোচে উত্তর দিয়াছিলেন, "কুলীনের ঘরে অমন হয়।"

শিরোমণি মহাশয় যাহাকে গৃহিণীপদে স্থাপন করিয়াছিলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছিল। একপুত্রের জননী হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি পুত্রটী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; পুত্র তাহার পূর্ব্বেই সংসারখেলা শেষ করিয়াছিল। সুতরাং গৃহিণীর মৃত্যুতে শিরোমণির সংসারটা একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহাতে তিনি ততদূর বিচলিত বা কাতর হইলেন না। কেননা, তখন তিনি নিজেও ভবের হাট হইতে দোকান পাট গুটাইয়া পারে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র তাঁহার পারে যাওয়া হইল না। শ্রীহরির ইচ্ছায় আবার তাঁহাকে ভাঙ্গা হাটে, গুটান দোকান পাতিয়া

বসিতে হইল। তবে শেষ বেলায় দোকান পাতিলেও তিনি আর তেমন কেনা বেচার বা লাভলোকসানের দিকে নজর রাখিতে পারিলেন না। আফিসের কেরাণীবাবু যেমন নির্দ্দিষ্ট কলম পিষিয়াই আপনার কর্ত্তব্য শেষ করেন, সাহেবের লাভলোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখেন না, তাঁহারও এখন সেই অবস্থা। এজন্য কিন্তু কারবারে তাঁহার কিছু কিছু লোকসান হইতে লাগিল। তিনি সে দিকে ফিরিয়াও দেখিলেন না।

এখন শিরোমণি মহাশয় স্নানান্তে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, রঘুনাথের ঘরটী কেমন পরিষ্কাররূপে মার্জ্জিত হইয়াছে! পুষ্পপাত্রটী কেমন সুন্দর সাজান হইয়াছে! হরসুন্দরীর হাত না হইলে কি এমন হয়? তারপর আসনপাতা হইতে আরম্ভ করিয়া শিব পূজার মাটীটি পর্য্যন্ত সমালোচনা করিতে করিতে তিনি তাহাদের মধ্যে হরর এমন একটি গুণ ও মাধুর্য্য দেখিতে পান যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হরই তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিকের বিষয় হইয়া পড়ে। ইহার পর পূজা করিতে বসিয়া ইষ্টদেবের পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে একখানি গোলগাল মুখের আবির্ভাব দর্শনে আবার তাঁহাকে বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয়। ধ্যান করিতে করিতে বাহিরে পদশব্দ শুনিলেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টিটা সেই কোমল পদশব্দকারিণীর অনুসন্ধান করে। আহার করিতে বসিলে, হর যখন পরিবেশন করে, তখন হরর স্বহস্তপক্ক ব্যঞ্জন এবং তাহার রূপসুধা, এই উভয়ের মধ্যে কোনটা অধিক সুমিষ্ট এবং লোভনীয়, ইহা স্থির করিতে তাহার অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়। শেষে হয়তো নিমঝোলের সঙ্গে অম্বল মাখিয়া অথবা ডাউলের পরিবর্ত্তে গ্লাসের জলটা ভাতে ঢালিয়া কোনরূপে আহার শেষ করেন। আহারান্তে এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিয়া বলেন, "হরিহে সকলই তোমার ইচ্ছা!"

এইরূপে শিরোমণি মহাশয় জীবনের শুষ্ক সন্ধ্যাকালে একটা উজ্জ্বল

আলোক পাইয়া আপনার জীর্ণপ্রায় জীবন-তরণী খানি আবার সংসার-সমুদ্রে ভাসাইয়া চলিলেন। কিন্তু তরণী যে বিপথে চলিল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। হর তাহা লক্ষ্য করিল। যাহার সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক থাকে, সে প্রায় অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়।

(৩)

হরসুন্দরী যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার জন্য স্বামীর ধর্ম্ম কর্ম্ম, জপতপ, পরকালের কাজ সব নষ্ট হইতেছে, তখন তাহার বড় কষ্ট হইল। সে কেবল শিরোমণি মহাশয়ের ভার্য্যা নহে—সহধর্ম্মিণী। তাই স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মে ত্রুটী দেখিয়া সহধর্ম্মিণীর হৃদয় ব্যথিত হইল। কিন্তু ব্যথিত হইলেও সে মুখ ফুটিয়া স্বামীকে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। আজকালিকার ঠাকুরাণীরা স্বামীর কোন বিষয়ে ত্রুটী দেখিলে সহ্য করিতে পারেন কিনা জানি না, কিন্তু সে কালের ঠাকুরাণী—সেই 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' হরসুন্দরী স্বামি-দেবতার মুখের উপর তাঁহার ত্রুটীর কথা বলিতে পারিল না।

তা' এইরূপে একজন যুবতী ভার্য্যার মুখের দিকে চাহিয়া, আর একজন বৃদ্ধ স্বামীর ত্রুটী দর্শনে ব্যথিত হৃদয় লইয়া কতদিন কাটাইত বলা যায় না, কিন্তু সহসা এমন একটা দিন আসিল, যে দিন ঘটনার একটী সামান্য মাত্র আঘাতে—একটী মাত্র কথায় শিরোমণি মহাশয়ের কোমল-প্রেমমুগ্ধ হৃদয় আবার বৈরাগ্যের কঠোর পথ অবলম্বন, করিল।

একদিন—সে দিনটা বড় সুখের দিন নহে,—একে শীতের অপরাহ্ণ, তাহাতে আকাশে একটু একটু মেঘ করিয়াছিল, শীতের প্রভাবকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। রসিকচূড়ামণি কোকিল বাবাজি পাখা গুটাইয়া তেঁতুল গাছের ঘন ঝোপের ভিতর আশ্রয় লইয়াছিল, কন্দর্পঠাকুর পুষ্পচাপ ফেলিয়া সপরিবারে আগুন পোহাইতে বসিয়া

গিয়াছিলেন। আর শিরোমণি মহাশয় একখানা লাল বনাতে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, বসিয়া বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চক্রবর্ত্তীর টীকা দেখিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে শীতকম্পিত হস্তে একটা বাঁখারির কলম দিয়া পুঁথির আশে পাশে কি লিখিতেছিলেন। কিন্তু দেখিলে বা লিখিলে কি হয়, তাঁহার চঞ্চল মনটা যে ভাগবতের মধুর-রসাত্মক কৃষ্ণলীলার উপর বা তদপেক্ষা মধুর চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরসপূর্ণ টীকার উপর নিবদ্ধ ছিল না, তাহা তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টি দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। সহসা তিনি চঞ্চল দৃষ্টিটী পুস্তক হইতে অপসারিত করিয়া ডাকিলেন,—"হর!" কোন উত্তর আসিল না। আবার ডাকিলেন, "ও হর!" এবারেও উত্তর নাই। তখন শিরোমণি একটু উচ্চকণ্ঠে—একটু সোহাগের স্বরে ডাকিলেন, "ও হরসুন্দরি!"

এবার উত্তরের পরিবর্ত্তে স্বয়ং হরসুন্দরী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং মুখখানাকে সেই শীতের সন্ধ্যার মতই গম্ভীর করিয়া বলিল, "কেন?"

শিরোমণি একটু ইতস্ততঃ করিয়া, কেশশূন্য ব্রহ্মরন্ধ্রে কয়েকবার হস্তসঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "না, এমন কিছু নয়,—তা বলি, এমন শীতের সময় হচ্চে কি? বসে একটু পুঁথি শোন না।"

হর গম্ভীর মুখখানা একবার ঘুরাইয়া, একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "না, আমি তোমার পুঁথি শুনবো না।"

শিরোমণি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে তাহার গম্ভীর মুখখানার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! তুমি—তুমি ভাগবত শুনবে না? হয়েছে কি?"

শিরোমণির যেন বিশ্বাস, হর যদি ভাগবত না শুনে, তাহা হইলে এমন সুন্দর ভাগবতখানা বৃথাই বেদব্যাসের লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছিল।

হ। ভাগবত শুন্‌লে তো আর পেট ভরে না ?

শি। পেট না ভরিলেও পরকালের কাজ হয়।

হ। আমাদের এখনও পরকাল ভাববার দেরী আছে ; পরকাল যাদের কাছাকাছি, তারা কি সে কথা ভাবে ?

শিরোমণি একবার তীব্র দৃষ্টিতে হরর মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সে মুখে—সে দৃষ্টিতে তিরস্কারের কি কুটিল ছায়া। তিনি মুখ নামাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হুঁ।"

হর চলিয়া গেল। শিরোমণি মহাশয় মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ সন্ধ্যাকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। সত্যই তো, পরকাল যাহাদের কাছাকাছি, দিন যাহাদের ফুরাইয়া আসিয়াছে, মহাকালের দূত যাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহারা কি পরকালের কথা ভাবে ? কই ভাবে ? ভাবিলে ভাগবত ফেলিয়া হরকে ডাকে কেন ? হরিকে ভুলিয়া হরর রূপধ্যানে মগ্ন কেন ? ভগবৎপ্রেম ছাড়িয়া যুবতীর প্রেমে বিভোর কেন ? হায়, তবে কি হইবে ? ঐ যে শিয়রে দাঁড়াইয়া মহাকাল অট্টহাসি হাসিতেছে। কোথায় হে দয়াময় দীনবন্ধু ! এ বন্ধন হইতে মুক্তি দাও ঠাকুর ! এই আলোক-অন্ধকার-মিশ্রিত জীবনসন্ধ্যায় একবার প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ডাকিয়া, সমস্ত জীবনের কার্য্যাকার্য্য তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়া মহাকালের হস্তে আত্মসমর্পণ করি।

মুহূর্ত্তের জন্য বৈরাগ্যের তীব্র উচ্ছ্বাসে শিরোমণির হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু অমনই পশ্চাৎ হইতে সংসারের একটা জোর টান পড়িল। শিরোমণি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী।"

'কিন্তু'—শিরোমণি ভাবিলেন, "কিন্তু কথাটার অর্থ কি ? 'আমাদের এখনও পরকাল ভাব্‌বার দেরী আছে।' গর্ব্ব—যৌবনের গর্ব্ব, রূপের

গর্ব্ব ! 'যাদের পরকাল কাছাকাছি,'—সে কে ? আমি ! শ্লেষ ! অবজ্ঞা ! বৃদ্ধ বলিয়া অবজ্ঞা ! বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি যুবতী স্ত্রীর ঘৃণা ! হায় ঠাকুর ! কেন এ বৃদ্ধকে শেষ বয়সে এ বন্ধনে জড়াইলে ?"

সেই শীতের উদাস সন্ধ্যায় শিরোমণি মহাশয় বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। সম্মুখে চিরপ্রিয় ভাগবতখানা পড়িয়া রহিল, সে দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

হর আসিয়া বলিল, "সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হইয়াছে।"

শিরোমণি ধীরে ধীরে উঠিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সে দিন আর তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক হইল না ; তিনি কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া রঘুনাথের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "আর কেন ঠাকুর ! বৃদ্ধকে এ বন্ধন হইতে মুক্ত কর।"

(৪)

ভালবাসার দৃষ্টিতে আমরা যে গুলিকে সুন্দর দেখি, বিরক্তির দৃষ্টিতে সেই গুলিই আবার অতি কুৎসিত—অতি বিরক্তিকর হইয়া থাকে। এখন শিরোমণি মহাশয় হরসুন্দরীর প্রতি কার্য্যে, প্রতি কথায় ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব দেখিতে লাগিলেন, প্রতি পদক্ষেপে তাহার গর্ব্বের পরিচয় পাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সংসারের সান্নিধ্যটাও বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। সংসার হইতে দূরে যাইবার জন্য তাঁহার আহত অবসন্ন প্রাণটা আকুল হইয়া পড়িল।

সুযোগও ঘটিল ! একদিন মধ্যাহ্নকালে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসীর সহিত কথায় বার্ত্তায় শিরোমণি মহাশয় বুঝিলেন, সন্ন্যাসী পরম জ্ঞানী, বিজ্ঞ, যথার্থ সাধু। তখন সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার অনেক কথা, অনেক পরামর্শ হইল। তারপর একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি সন্ন্যাসীর সহিত গৃহত্যাগ করিলেন।

গৃহত্যাগের পর চারি পাঁচ মাস সন্ন্যাসীর সহিত ভ্রমণ করিয়া শিরোমণি বুঝিতে পারিলেন যে, বন্ধনটা কেবল গৃহেই নহে, তাহার আকর্ষণ সর্ব্বত্রই আছে। আর সে আকর্ষণকে ছিন্ন করাও দুষ্কর—অতি নিষ্ময়ের কার্য্য। সুতরাং এরূপ ভাবে কঠোর ক্লেশ সহ্য করা অপেক্ষা সেই কোমল বন্ধনটাকে লইয়া গৃহে বসিয়া সুখ শান্তিতে ধর্ম্মচর্চ্চা করাই সঙ্গত। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শিরোমণি মহাশয় সন্ন্যাসীর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহযাত্রা করিলেন।

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম। যে আষাঢ়ের প্রারম্ভে বিরহী যক্ষ, দূর শৈলশৃঙ্গে বসিয়া মেঘের নিকট আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস ঢালিয়াছিল, সেই আষাঢ় মাসের একটী মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে গৃহবিরহী শিরোমণি আসিয়া আপনার গৃহদ্বারে দাঁড়াইলেন। কিন্তু এতদিনের পর প্রবাস-প্রত্যাগত শিরোমণিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সেখানে কেহই ছিল না। কেবল রুদ্ধ গৃহদ্বার একটা উপহাসের পাত্র হাসি হাসিয়া নীরবে তাহাকে তিরস্কার করিল। তারপর প্রতিবাসী হারু চক্রবর্ত্তী আসিয়া জানাইল যে, যে বন্ধনটার আকর্ষণে তিনি আবার গৃহে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন, দুই তিন দিন পূর্ব্বে সে বন্ধনটা রথস্থ বামনদেবের দর্শনে আপনার ভববন্ধন ছেদনের আশায় গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রতিবাসী ও প্রতিবেশিনীগণের সহিত শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছে। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের চিহ্ন সেই রুদ্ধ গৃহদ্বারে অঙ্কিত করিয়া শিরোমণি শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন।

(৫)

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। বনমধ্যস্থ কর্দ্দমাক্ত সড়ক্ দিয়া কত যাত্রী উল্লাসধ্বনি করিতে করিতে জগন্নাথ দর্শনে ছুটিয়াছে। 'জয় জগন্নাথ' রবে আকাশ কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একে একে অনেক যাত্রিদল চলিয়া গেল। পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে দুই একজন মুমূর্ষু পড়িয়া আছে, তাহারা জগন্নাথের পরিবর্ত্তে কালের করালমূর্তি সম্মুখে দেখিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের, অপূর্ণ কামনার কাতরতা ব্যক্ত করিতেছে। কিন্তু তাহাদের পানে কে চায়? সকলেই রথোপরি বামনদেবকে দর্শন করিয়া পুনর্জ্জন্ম বিনাশের আশায় উল্লাসিত; এ সময়ে সংসারের পরপার-যাত্রীর কথায় কে কর্ণপাত করে?

একজন কর্ণপাত করিল,—সে শিরোমণি। শিরোমণি কোন দলের মধ্যে নহেন, তিনি একা। সকলের পশ্চাতে তিনি একা ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন। সহসা একটা ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি উঠিল, "উঃ মাগো, জল।" শিরোমণি ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, অদূরে কর্দ্দমিত বৃক্ষতলে এক মুমূর্ষু রমণী। রমণী ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে সংসারের নিকট শেষ প্রার্থনা জানাইতেছে, "জল!"

শিরোমণি ধীরে ধীরে রমণীর নিকটস্থ হইলেন। রমণী আর একবার ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "জল!" শিরোমণি তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চীৎকারের সহিত তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "হর!" দিগন্ত হইতে প্রতিধ্বনি আসিল, "ও-ও"। শিরোমণি ছুটিয়া গিয়া হরর মস্তক কোলে তুলিয়া লইলেন। স্বামীর কোল পাইয়া হর বুঝি সুদূর মৃত্যুদ্বার হইতে একবার ফিরিয়া চাহিল, তাহার জগন্নাথ দর্শনের আশা, অন্তিমের কামনা বুঝি মিটিয়া গেল। তাহার মৃত্যু-কালিমাচ্ছন্ন মুখে তৃপ্তির—হাস্যের ক্ষীণজ্যোতি ভাসিয়া উঠিল। শিরোমণি কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "হর!"

সে আহ্বান বুঝি আর হরর কাণে গেল না। সে তখন স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, আরাধ্য দেবতার মুখের দিকে চাহিয়া, পরিতৃপ্ত হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছে, তাহার সংসারের

শেষ-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। শিরোমণি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কানন প্রকম্পিত করিয়া তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল।

যে বন্ধন মোচনের জন্য শিরোমণি একদিন আকুল প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আজি তাহার সে বন্ধন মোচন হইয়া গেল। কিন্তু ভগবান্ যে এরূপ ভাবে এমনই করিয়া তাঁহার বন্ধন মোচন করিবেন, তাহা তিনি একবারও ভাবেন নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে শিরোমণি বলিলেন, "হায় ঠাকুর! যখন আপনি বাঁধন পরিতে আসিলাম, তখনই বন্ধন মোচন করিলে?"

পরাজয়

(১)

"শ্রীচরণকমলেষু,

ঠাকুর মা, পাঁচ বছর পরে তোমায় চিঠি লিখ্‌ছি। আমার আর লিখ্‌বার মুখ নাই, কাজেই লিখি নি। কিন্তু আজ আর না লিখ্‌লে নয়। আমার কষ্টের কথা জানাতে তুমি ছাড়া জগতে আর কেউ নাই। আমরা বড় কষ্টে প'ড়েছি। উনি বাতে জ্বরে আজ ছ'মাস শয্যাগত, চাকরীটি গেছে। এতদিন গহনাপত্র বেচে কোনও রকমে চালিয়েছি, কিন্তু আর চলে না। তিন মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী, চারদিকে দেনা। খোকার অসুখ, পয়সার অভাবে চিকিৎসা হচ্চে না। এ সময়ে তোমার বিবেচনায় যা হয় ক'রো। তুমি কেমন আছ, সিদু কাকা কেমন আছে লিখবে। ইতি

তোমার স্নেহের ইন্দু।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে তারাসুন্দরী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তাহার শান্ত মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও ঘৃণার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; ললাটের শিরা স্ফীত, নাসাগ্র কুঞ্চিত হইল। তিনি পত্রখানাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। আপন মনে বলিলেন, "একটী পয়সাও না।"

সিদু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি এল বড় মা?"

"ইন্দুর।"

"কি লিখেছে?"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "লিখ্‌বে আর কি মাথামুণ্ড ; কষ্টে পড়েছি, খেতে পাই না, কিছু দাও।"

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে সিদু বলিল, "তা বড় মা, কিছু দিলে ভাল হ'তো না ?"

"ভাল হ'তো ?" রোষে গর্জ্জন করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "ভাল হ'তো ? তোর মত আহাম্মকের কাছে ভাল হয় বটে, কিন্তু আমার কাছে নয়। সেই এক রত্তি মেয়ে, তার কাছে আমি মাথা হেঁট করব ? কিছুতেই নয়।"

সিদু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "তা বটে, তবে কিনা বড় কষ্টে পড়েছে।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "কষ্টে পড়েছে তা আমার কি ? গেল কেন ? এতই যদি কষ্ট, তবে এখানে এল না কেন ? এলে কি আমি তাড়িয়ে দিতাম ? তা নয় সিদু, অহঙ্কার, এখনও সেই অহঙ্কার ! আমার কাছে আস্‌বে না, আমার ভিটেয় জলগ্রহণ কর্‌বে না। বেশ, অহঙ্কার নিয়েই থাক, আমি একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য কর্‌ব না।"

সিদু বড় মাকে বেশ চিনিত। বড় মা একবার 'না' বলিলে আর তাহা 'হাঁ' হয় না। অগত্যা সে সাহায্যের প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া বলিল, "যদি রাগ না কর বড় মা, তবে একটা কথা বলি।"

তারাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোর কথায় রাগ ! এমন কি কথা রে সিদু !"

বড় মার মুখে হাসি দেখিয়া সিদু সাহস পাইয়া বলিল, "অনেক দিন মাকে দেখিনি, একবার দেখে আস্‌তে ইচ্ছা হয়।"

তারাসুন্দরীর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল আবার বিরক্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তিনি বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে

বলিলেন, "ইচ্ছা হয় যেতে পার, কিন্তু আর এ-মুখো হ'ও না। সবাই যখন গেছে, তখন তুমিই আর থাকবে কেন? নেমকহারাম,—সংসারে সব নেমকহারাম।"

ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে তারাসুন্দরী ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হে রাধানাথ! যারা আমায় এমন করে কাদাচ্চে, তাদের—" চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। প্রার্থনা শেষ না করিয়াই তিনি দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সিদুও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেল।

ইন্দুর কষ্ট শুনিয়া সিদু প্রাণে বড় আঘাত পাইল। হায়, সে যে ইন্দুকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে নীচ-জাতি হইলেও ইন্দু যে তাহার মুখের খাবার কাড়িয়া খাইয়া মানুষ হইয়াছে। সেই ইন্দু যখন অভিমানে তাহার পৈত্রিক গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন সিদুর প্রাণে যে কি আঘাত লাগিল, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? সিদুর ইচ্ছা হইল, সেও ইন্দুর সঙ্গে ছুটিয়া যায়। কিন্তু বড় মাকে ফেলিয়া সে যাইতে পারিল না।

তারপর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। এত কাল পরে পত্র লিখিয়া ইন্দু পিতামহীর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছে। যাহার পৈতৃক বিষয় ভোগ করিবার লোক নাই, ব্যয়ের অভাবে যাহার টাকায় ছাতলা ধরিতেছে, সে আজ অন্যের সাহায্যপ্রত্যাশী, এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল! হায় ভগবান্!

ইন্দুর কষ্টে মর্ম্মাহত হইয়া সিদু যখন বড়মাকে অনুরোধ করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন সে স্থির করিল, সে নিজে একবার ইন্দুর নিকট যাইবে, তাহাকে বুঝাইয়া এখানে লইয়া আসিবে। ইন্দু যদি একবার আসিয়া তারাসুন্দরীর সম্মুখে দাঁড়ায়, তাহা হইলেই তাহার রাগ আর থাকিবে না, সব গোল মিটিয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়াই সিদু বড়মার

নিকট একবার ইন্দুর কাছে যাইবার অনুমতি চাহিল ; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তারাসুন্দরী সে অনুমতি দিলেন না। বিনানুমতিতে সিদু বড়মাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। সে যে বড়মার নিকট সুদৃঢ় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ! সে আজ কত দিনের কথা। যে দিন একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালক পিতার তাড়নায়, বিমাতার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া আশ্রয়ের আশায় সংসার-অরণ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, সে দিন যে তারাসুন্দরীই অভয় দিয়া তাহাকে আপনার স্নেহ-শীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়াছেন ; অজস্র স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহার নির্জ্জীব প্রাণকে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। সে কত দিনের কথা। তাহার পর সংসারে কত প্রলয় ব্যাপার ঘটিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বড়মার সে স্নেহ, সে করুণার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এমন স্নেহময়ী করুণাময়ীকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারে না। গেলে তাহার নরকেও স্থান হইবে না।

স্নেহের শত অনুরোধ, হৃদয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সিদু বড়মাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না।

(২)

স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ সকলেই যখন একে একে সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল, তখন তারাসুন্দরী বড় আগ্রহেই তিন বৎসরের পৌত্রী ইন্দুকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। ধরিয়া শোকসন্তপ্তা বিধবা শোকে একটা গভীর সান্ত্বনা পাইলেন, শূন্য সংসারে আবার পূর্ণতার ছায়া দেখিলেন, ছিন্নপ্রায় সংসার-বন্ধন আবার তাঁহাকে মমতার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

স্বামী হরবল্লভ রায় মৃত্যুকালে বার্ষিক তিন চারি হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তা ছাড়া দশ হাজার টাকার

কোম্পানীর কাগজ ছিল। সুতরাং অন্নবস্ত্রের ভাবনা ছিল না। পুরাতন ভৃত্য সিদু বা সিদ্ধেশ্বরের কার্য্যপটুতায় সাংসারিক কার্য্যের দিকেও চাহিতে হইত না। কেবল ইন্দুর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, আদরযত্ন দেখাইয়া, আর গৃহ-দেবতা রাধানাথের সেবা করিয়া তারাসুন্দরী জীবনের নীরস দিনগুলাকে বেশ সরসভাবেই কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। যদি কখনও কোনও বিনিদ্র নিশীথে আর একখানি সমুজ্জ্বল সংসারচিত্র স্মৃতিফলকে ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে তিনি সুষুপ্ত ইন্দুর ক্ষুদ্র মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেন, "সেগুলা স্বপ্ন, আর এইটাই সত্য।"

এইরূপে তারাসুন্দরী আপনার হৃদয়ের সকল আগ্রহ, সকল কামনা ঢালিয়া দিয়া ইন্দুকে লইয়া নূতন সংসারপথে চলিতে লাগিলেন।

পিতামহীর অজস্র স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া, সিদু কাকার অবাধ ভালবাসা ভোগ করিয়া ইন্দু দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। তারাসুন্দরী যথেষ্ট সমারোহসহকারে ইন্দুর বিবাহ দিলেন। তিনি ইন্দুকে পরের হাতে তুলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু পরের ঘরে যাইতে দিতে পারিলেন না। জামাতাকে ঘরে রাখিয়া দিলেন। পরের ঘরে যাইতে না দিলেও ইন্দু যে পর হইয়া গেল, ইহা তাঁহার স্নেহমুগ্ধ হৃদয় বুঝিয়াও বুঝিল না।

জামাতা রমেশচন্দ্র দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু সদ্বংশজাত। স্বভাব-চরিত্রও ভাল। এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর মাতাপিতৃহীন হওয়ায় আর পড়াশুনার সুযোগ হয় নাই। তারাসুন্দরীও সেজন্য দুঃখিত নহেন। আর বেশী পড়িয়া কি হইবে? তাহাকে তো আর চাকরী করিয়া খাইতে হইবে না।

নাতিনী নাতজামাই লইয়া কিছুদিন বড় সুখেই কাটিল। তাহাদের

পরস্পর আন্তরিক ভালবাসা দেখিয়া, উভয়ের প্রণয়-কলহে মধ্যস্থতা করিয়া তারাসুন্দরী যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে একটী ক্ষুদ্র শিশু আসিয়া তাঁহার অন্ধকারময় গৃহ আলোকিত করিল। তারাসুন্দরীর সুখের সীমা রহিল না। এত শোক, এত দুঃখের পর যে এমন স্বর্গীয় সুখের আবির্ভাব হইবে ইহা কে জানিত? তারাসুন্দরী রাধানাথের সম্মুখে মাথা কুটিয়া বলিতেন, "ঠাকুর, তোমার দয়া অসীম। শেষের কয়টা দিন এইরূপেই কাটাইয়া দাও দয়াময়!"

ঠাকুর বুঝি অলক্ষ্যে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিলেন। কেন না কিছু দিন পরেই তারাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন, সংসারে সুখ কোথায়? যাহাকে তিনি শান্তির স্নিগ্ধ উৎস স্থির করিয়াছিলেন, তাহা অশান্তির উষ্ণ প্রস্রবণ মাত্র। হায় নির্ম্মম সংসার!

(৩)

দরিদ্র-সন্তান রমেশ যখন দেখিল, সে তারাসুন্দরীর এতটা বিষয়ের একমাত্র মালিক, তখন আর সে আপনাকে ঠিক রাখিতে পারিল না। গ্রামের অনেক যুবক ও প্রৌঢ় আসিয়া অযাচিতভাবে তাহার শুভানুধ্যানে ব্যাপৃত হইল, এবং তাহাকে সম্রাট্ অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসাইয়া আপনাদের স্বার্থসাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। অপক্কবুদ্ধি রমেশের মাথার ভিতরে কেমন গোলমাল হইয়া গেল, পাঁচ জন শুভানুধ্যায়ীর সহিত মিশিয়া সে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পদার্পণ করিল।

কথাটা চাপা রহিল না, তারাসুন্দরীর কাণে গেল। তারাসুন্দরী রমেশকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু ফল কিছু না পাইয়া তাহার মতি-পরিবর্ত্তনের জন্য ঠাকুরের নিকট মাথা কুটিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে রমেশ ও ইন্দু একপ্রাণ ছিল, কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই, ক্রমে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতে লাগিল। দুশ্চরিত্র স্বামীকে

পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে গিয়া ইন্দু নিত্য তিরস্কৃত ও অবমানিত হইতে থাকিল। ইহা ছাড়া মনোমালিন্যের আরও একটা কারণ ছিল। রমেশের এখন নিত্য নূতন অভাব। যে অভাবের তাড়নায় রাজ্যেশ্বরের রাজকোষ উড়িয়া যায়, রমেশ এখন সেই অভাবের তাড়নায় পড়িল। সে তারাসুন্দরীর নিকট মাসিক যাহা কিছু পাইত, তাহা তো খরচ হইতই, তাহা ছাড়া ইন্দু যাহা পাইত, তাহাও লইত। কিন্তু এ সকলই সমুদ্রের নিকট শিশিরবিন্দু মাত্র। রমেশের এখন সম্পত্তিতে কোন অধিকার নাই, সুতরাং কেহ টাকা ধার দিতে চাহিত না। অগত্যা রমেশ টাকার জন্য ইন্দুকে উৎপীড়ন করিত। কিন্তু ইন্দু টাকা কোথায় পাইবে? সে তো স্বামীর দুষ্কর্মে ব্যয়ের জন্য পিতামহীর নিকট টাকা চাহিতে পারে না! মূর্খ রমেশ তাহাই করিতে বলিত, ইন্দু ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় স্বামীর নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইত।

এ লাঞ্ছনার কথা ইন্দু গোপনে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া ঘনীভূত দেখিয়া তারাসুন্দরী সকলই বুঝিলেন, বুঝিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন।

তারাসুন্দরী কিন্তু এ আঘাতের কোনই প্রতিকার করিতে পারিলেন না। রমেশকে তিরস্কার করিতে গেলেই ইন্দু সজলনেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে বলিত, "তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর মা, ওকে কিছু ব'লো না। ও বড় অভিমানী।"

ইন্দুর এই কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তারাসুন্দরী শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেন।

কোনও প্রতিবন্ধ না পাওয়ায় রমেশের অত্যাচার দিন দিন বাড়িতে লাগিল। একদিন সে মদ খাইয়া সঙ্গীদের সহিত বৈঠকখানায় আসিয়া

কল্লা করিতে লাগিল। পবিত্র দেবমন্দিরে ভূতের এই তাণ্ডব নৃত্য সিন্থুর সহ্য হইল না ; সে গিয়া রমেশকে দুই চারি কথা শুনাইয়া দিল। রমেশের হাতে চাবুক ছিল, সেই চাবুক সিন্থুর পিঠে সপাসপ বসাইয়া দিল।

সিন্থু ছুটিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইল, কিন্তু তাহার বেত্রক্ষত পৃষ্ঠদেশ কোথায় লুকাইবে খুঁজিয়া পাইল না।

সিন্থু না বলিলেও তারাসুন্দরীর উহা শুনিতে বাকী রহিল না। শুনিয়া তিনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইন্দু তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল, "ওর কোন দোষ নাই ঠাকুর মা, পাঁচজনে ওকে অমন করেছে।"

সে কথায় তারাসুন্দরীর ক্রোধাগ্নি শান্ত হইল না, বরং দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তবে সে অগ্নিতে তিনি রমেশকে দগ্ধ করিলেন না, নিজেই দগ্ধ হইতে লাগিলেন ; আর মাথায় হাত চাপড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সিন্থুকে না মেরে হতভাগা আমায় মারলে না কেন ? সিন্থু যে আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী।"

শেষে সিন্থু আসিয়া পায়ে হাতে ধরিয়া তাঁহাকে শান্ত করিল।

(৪)

অপরাহ্নকালে তারাসুন্দরী রাধানাথের সান্ধ্য আরতির উদ্যোগ করিতেছিলেন। খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া ইন্দুও তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। সে একখানা পাটের কাপড় পরিয়া বঁটির উপর আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়া ফল ছাড়াইতেছিল, আর এক বৎসরবয়স্ক খোকার বিষম দুর্ব্বৃত্ততার নানা উদাহরণ দিয়া ঠাকুরমার নিকট অনুযোগ করিতেছিল। তারাসুন্দরী পঞ্চপ্রদীপ সাজাইতে সাজাইতে ইন্দুর এই স্নেহের অনুযোগ শুনিতেছিলেন, আর এক একবার স্নেহসজলনেত্রে ইন্দুর হাসিভরা মুখখানির দিকে চাহিতেছিলেন।

সহসা জুতার মস্‌মস্‌ শব্দে চারিদিক্‌ কাঁপাইয়া রমেশ প্রাঙ্গণে আসিযা দাঁড়াইল। ঠাকুরমা ও নাতিনী উভয়েই বিস্মিতদৃষ্টিতে তাহার দিকে একবার চাহিল। ইন্দু তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিযা দিল।

রমেশ আসিয়াই ব্যস্তভাবে ইন্দুকে ডাকিযা বলিল, "এদিকে এস।"

ইন্দু মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিল। রমেশ তীব্র কণ্ঠকে আরও তীব্র করিয়া বলিল, "আর ঘোমটা টান্‌তে হবে না। আমার দাড়াবার সময় নাই, কলকাতার ট্রেণ ধর্‌তে হবে। তাগা জোড়া কোথায় ?"

তাহার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "তাগা! তাগা কি হবে রমেশ ?"

"কি আর হবে ? আমার দরকার।"

"ইন্দুর তাগায় তোমার কি দরকার ?"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া রমেশ বলিল, "কি দরকার সে কথা ফিরে এসে বল্‌ব। উঠ্‌লে না ?"

রমেশ যে তাহার ঘৃণিত অভাব-পূরণের জন্য ইন্দুর অলঙ্কারে হাত দিয়াছে, তারাসুন্দরী তাহা এই প্রথম জানিতে পারিলেন। জানিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিলেন, "রমেশ!"

সে ক্রুদ্ধ আহ্বান রমেশের কাণে গেল না, সে তখন কল্পনায় হীরামন বিবির বেহাগের মধুর ঝঙ্কার শুনিতেছিল। কার্য্যসিদ্ধির বিলম্বতায় অধীর হইয়া রমেশ পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিল, "এখনও উঠলে না ? পায়ের ঢেঁকী কি হাতে ওঠে ?"

ইন্দু লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরিয়া গেল ; সে অর্দ্ধ-কর্ত্তিত ফলটী হাতে লইয়া অবনতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল।

রমেশের আর সহ্য হইল না, সে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া, জুতা পায়ে

হুড়মুড় করিয়া ঠাকুর-ঘরের দরজায় উঠিয়া পড়িল। তারাসুন্দরী বাধা দিবার জন্য হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। ক্রোধোন্মত্ত রমেশ তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া ইন্দুর হাত ধরিয়া টান দিল। বঁটিটা উল্‌টাইয়া ইন্দুর পায়ের উপর পড়িল। পা কাটিয়া গেল, শোণিতধারায় মন্দিরতল সিক্ত হইতে লাগিল।

তারাসুন্দরীর নেত্রদ্বয় জলিয়া উঠিল, ভূকম্পনে পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় দেহ একবার কাঁপিয়া স্থির হইল। তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিয়া কুলিশকঠোর কণ্ঠে ডাকিলেন, "রমেশ !"

সে ভীষণ কণ্ঠস্বরে রমেশ শিহরিয়া উঠিল; একবার তারাসুন্দরীর জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে চাহিয়াই মন্ত্রমুগ্ধবৎ মস্তক নত করিয়া দাড়াইল। তারাসুন্দরী কর্ত্রীর অনুজ্ঞাসূচক স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি এখনই এবাড়ী হ'তে দূর হ'যে যাও, আমি তোমার মত চণ্ডালের মুখ দেখ্‌তে চাই না।"

রমেশ মুখ তুলিয়া চাহিল, দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "বেশ ! এখনই ?"

'এখনই, এই মুহূর্ত্তে। তোমার জিনিস পত্র যে আছে নিযে এখনই দূর হও। এবাড়ীতে যদি তোমার আর সূর্য্যাস্ত হয়, তবে তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান নও।"

রমেশ শুধু একবার ভ্রূকুটী করিয়া চাহিল, তারপর ইন্দুর হাত ছাড়িয়া দিয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

ইন্দু কাঁপিতে কাঁপিতে পিতামহীর পদতলে বসিয়া পড়িল। তারা-সুন্দরী এক পা পিছাইয়া দাড়াইলেন; গম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন, "বারণ করছি ইন্দু, ও হতভাগার জন্য আর কোন অনুরোধ ক'রো'না।"

ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া দাড়াইল; তারপর ধীর পদে আপনার ঘরের দিকে চলিল। তারাসুন্দরী পুনরায় ঠাকুর-ঘর ধুইয়া মুছিযা আরতির উদ্যোগ করিয়া মালা হাতে দরজার নিকট বসিলেন। তাহার

হাতের মালা আজ বড় ঘন ঘন ঘুরিতে লাগিল। এইরূপেই তিনি আপনার অশান্ত মনটাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

(৫)

ইন্দু আসিয়া পিতামহীকে প্রণাম করিল। তাহার কোলে খোকা। তারাসুন্দরী সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একি ইন্দু ?"

খোকার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমরা চল্লাম।"

তারাসুন্দরীর মালা ঘোরা বন্ধ হইয়া গেল। বিস্ময়-স্তম্ভিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুই—তুই কোথায় যাবি ?"

ইন্দু কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, "ওর সঙ্গে।"

তারা। ওর—ওই হতভাগার সঙ্গে ? ও কে ?

ইন্দু। আমার স্বামী।

তারাসুন্দরীর বুকের উপর যেন দুম্ করিয়া একটা মুগুরের ঘা পড়িল। ঐ পাপিষ্ঠ, যে মুহূর্ত্তপূর্ব্বে তাহাকে যার-পর-নাই লাঞ্ছিত করিয়াছে, সে হইল আপনার। ইন্দু লাঞ্ছিত, প্রহৃত হইয়াও তাহার সঙ্গ ছাড়িবে না; আর যে এতদিন বুকের উপর রাখিয়া, আপনার হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ, সমগ্র মমতা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছে, সে কেহই নহে, ইন্দু তাহাকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে! হায়, অকৃতজ্ঞ সংসার! অভিমানে, লজ্জায় তারাসুন্দরীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ইন্দুর দিকে না চাহিয়াই পরুষকণ্ঠে বলিলেন, "যাও।"

খোকা তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "দা, দা!"

তারাসুন্দরী সেদিকে ফিরিয়া চাহিলেন না, তিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া, নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হাতের মালা আবার দ্রুত ঘুরিতে লাগিল।

ইন্দু মৃদুপাদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণে নামিল। তারাসুন্দরী বলিলেন, "যাও, কিন্তু মনে রেখো, এ বিষয়ের একটী পয়সাও তুমি পাবে না।"

মৃদু হাসিয়া ইন্দু বলিল, "বিষয়ে আমার দরকার কি ঠাকুর মা!"

তারাসুন্দরী আর কিছু বলিলেন না, ইন্দু চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই একখানা গরুর গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ উঠিল, ক্রমে শব্দ দূর দূরান্তে মিলাইয়া গেল। তারাসুন্দরী নিস্পন্দ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিলেন।

তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া একটু একটু করিয়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। পথিক পথ বাহিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,—

"যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি, তারাত চাহে না আমারে।"

তারাসুন্দরীর বক্ষঃপঞ্জর ঠেলিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। তিনি উঠিয়া ঠাকুরঘরে ঢুকিলেন, প্রদীপ জ্বালিলেন। অন্ধকার-ময় গৃহ আলোকিত হইল। দীপের সমুজ্জল রশ্মিরেখা রাধানাথের মুখের উপর পড়িল, কৃষ্ণোজ্জল গণ্ডে সে স্বর্ণরেখার প্রতিভাস বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তারাসুন্দরী সেই আলোক-সমুজ্জল শান্ত-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলি-লেন, "রাধানাথ! সংসারে কেউ আপনার নয়। যাদের আপনার ভেবে তোমায় ভুলতে বসেছিলাম, তারা সব একে একে আমায় ফেলে চলে গেল। এখন ঠাকুর! তুমিই আমার আপনার, তুমিই আমার সব।"

তারাসুন্দরী আপনার দুঃখতপ্ত হৃদয় ভবদুঃখহারীর চরণপ্রান্তে ঢালিয়া দিলেন।

সিদু আসিয়া ডাকিল, "বড় মা!"

"কি?"

"সব চ'লে গেল ?"

"হাঁ।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সিহু জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরিয়ে আন্‌ব বড় মা ?"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার স্বরে তারাসুন্দরী উত্তর করিলেন, "না।"

সিহু আর কিছু বলিতে পারিল না; সে নীরবে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ-মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৬)

দুই মাস পরে কলিকাতা হইতে ইন্দুর পত্র আসিল। ইন্দু লিখিয়াছে;—"আমরা এখানে এসে একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে আছি। বাড়ীটা মন্দ নয়। ওর একটা চাকরী হয়েছে। আপনি আমাদের জন্য ভাববেন না, আমরা এক রকম সুখে আছি। খোকা ভাল আছে।"

পত্রখানা পড়িয়া তারাসুন্দরীর অভিমান ও ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। পত্রে একটুও ক্ষমাপ্রার্থনা নাই, এতটুকুও অনুতাপের গন্ধ নাই, আছে কেবল অহঙ্কার—"আমরা সুখে আছি।" এটা কি নিষ্ঠুর উপহাস নয় ? হায় অকৃতজ্ঞতা ! হায় নির্ম্মমতা ! তারাসুন্দরী পত্রখানা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

ইন্দুকে ভুলিবার জন্য তারাসুন্দরী প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তিনি রাধানাথের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন, দাস-দাসী ছাড়াইয়া দিয়া সংসারের সকল কাজ নিজের হাতে লইলেন। বাড়ীতে তিনি আর সিহু ছাড়া কেহ রহিল না।

ভুলিবার সঙ্কল্প করা যত সহজ, ভোলা তত সহজ নয়। বিশেষতঃ, যাহাকে ভুলিবার জন্য বেশী চেষ্টা করা যায়, তাহার কথাই বেশী মনে আসে। স্মৃতির তীব্র দংশনে তারাসুন্দরী জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন।

ইন্দু অপেক্ষা খোকার কথা মনে পড়িলে তিনি অধিকতর বিচলিত হইতেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি চোখের জল মুছিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন, "দূর হউক মায়া! যাকে বুকের রক্ত দিয়ে যোল বৎসর মানুষ করলাম, সে আপনার হ'লো না, আর এই এক বৎসরের একটা রক্তের ডেলার জন্য ভাবনা! ধিক্ আমাকে!"

তারাসুন্দরী অহরহঃ হৃদয়ের সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, আর দিনরাত ঠাকুরের সম্মুখে মাথা কুটিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "সব ভুলিয়ে দাও রাধানাথ, সব ভুলিয়ে দাও; এ মহাপাপিনীকে উদ্ধার কর। তুমি ছাড়া সংসারে আমার আর কেউ নাই।"

প্রার্থনা পূর্ণ হইল। দীর্ঘ চারি বৎসরের অবিরাম সংগ্রামে তারা-সুন্দরী হৃদয়ের উপর জয়লাভ করিলেন।

ইহার আরও এক বৎসর পরে ইন্দুর যে পত্র আসিল, প্রথম পরিচ্ছেদে তাহার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তারাসুন্দরীর হৃদয় তখন বিজয়গর্ব্বে স্ফীত, সুতরাং ইন্দুর দুঃখদৈন্যের সংবাদ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি ভাবিলেন, "আর কেন মায়ার বাঁধন? ইন্দু আমার কে? রাধানাথ ছাড়া আর কেউ আমার আপনার বলিতে নাই।"

(৭)

আরও একটা বৎসর কালস্রোতে ভাসিয়া গেল। এক বৎসর পরে রমেশের একখানা পত্র আসিল। রমেশ লিখিয়াছে,—

"শ্রীচরণেষু,

ইন্দু মৃত্যুশয্যায়। আপনাকে একবার দেখিবার জন্য তাহার বড় আগ্রহ। টাকা পয়সা চায় না, শুধু একবার দেখা। তাহার শেষ বাসনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলাম না বলিয়াই বাধ্য হইয়া আপনাকে পত্র লিখিতে হইল। আপনার যদি তাহাকে দেখিবার বা দেখা দিবার পক্ষে কোনও আপত্তি না থাকে, সত্বর আসিবেন। বিলম্বে আসা বৃথা। ইতি শ্রীরমেশচন্দ্র।"

তারাসুন্দরী দেখিলেন, পত্রখানা ৮ই তারিখের লেখা, আজ ১০ই। তাঁহার হাতের পত্রখানা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিলেন, "সিধু!"

সিধু আসিয়া সম্মুখে দাড়াইল; বড়মার মুখের দিকে চাহিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল; ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি হয়েছে বড় মা?"

তারাসুন্দরী ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কলকাতা যাবার গাড়ী কখন আছে?"

সিধু বলিল, "সন্ধ্যের গাড়ী চলে গেছে, কাল সকালে ৭টায় গাড়ী।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "একখানা গরুর গাড়ী ঠিক ক'রে রাখ্‌বি, যেন রাত ৪টায় আসে।"

সিধু সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বড় মা? ও কার চিঠি?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "রমেশের চিঠি, ইন্দুর অসুখ।"

সিধুর সম্মুখে পাছে আপনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এতদিনের কঠোর সংগ্রামের এই করুণ পরিণাম পাছে কেহ দেখে, এই আশঙ্কায় তারাসুন্দরী সিধুর সম্মুখ হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

হায় মানুষের দুর্ব্বলতা! হায় ব্যর্থ আত্মাভিমান!

রমেশের বাসার দরজায় একখানা ঠিকা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল; সিধু গাড়ীর চালের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া দিল; তারাসুন্দরী কম্পিতপদে স্পন্দিত বক্ষে গাড়ী হইতে বাহিরে আসিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, দরজার পাশে একটা জলভরা মাটীর ভাঁড় আর একটা সরায় আগুন। তারাসুন্দরী কাঁপিতে কাঁপিতে দরজার পাশে বসিয়া পড়িলেন; রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "ইন্দু! ইন্দু!"

পশ্চাতে কে হাঁকিল, "বল হরি হরিবোল!"

তারাসুন্দরী সভয়ে ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সে রমেশ। তিনি

উন্মাদকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ইন্দু, ইন্দু, আমি এসেছি, আমি এসেছি।"

ইন্দুর কোনও উত্তর আসিল না; শুধু রমেশ উচ্চকণ্ঠকে আরও উচ্চে তুলিয়া ডাকিল, "বল হরি হরিবোল!"

প্রায়শ্চিত্ত

(১)

যে দিন রোহিণীর বিবাহ হইয়াছিল, সে দিনটা তাহার নিকট যেমন একটা চিরস্মরণীয় সুখের দিন, তেমনই এক বৎসর পরে তাহার আবার একটা চিরস্মরণীয় দুঃখের দিন আসিল। সে দিন রোহিণী দেবতুল্য স্বামী হারাইয়া, শ্বশুরালয় হইতে বিতাড়িত হইয়া, অবলম্বনশূন্য পিতৃভবনে একটী দেড় বৎসরের শিশুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইল। কেহ কোথাও নাই, সংসার অন্ধকার, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ গাঢ় তিমিরে সমাচ্ছন্ন; সেই বিরাট্ অন্ধকারের মধ্যে দেড় বৎসর বয়সের ছোট ভাইটীর হাত ধরিয়া নিরাশ্রয়া রোহিণী একা দাঁড়াইল; এক ভগবান্ ছাড়া তাহাকে আর কেহ দেখিবার রহিল না, কেহ রাখিবার থাকিল না।

রোহিণীর একটু বেশী বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। তাহার বাপ মা গরীব ছিল, সুতরাং ত্রয়োদশ বৎসরের এদিকে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পারে নাই। তবে গরীব হইলেও রোহিণী যে নিতান্ত মন্দ ঘরে পড়িয়াছিল, তাহা নহে। সে কুৎসিতা ছিল না, সুতরাং জমিদার বাড়ীতে না হইলেও বিবাহটা একটু ভাল ঘরেই হইয়াছিল। বিবাহের পর রোহিণী স্বামীর নিকট একটু আদর যত্নও পাইয়াছিল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই এ আদর যত্নের শেষ হইয়া গেল। যে বৈশাখে বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পরের বৈশাখে রোহিণীর কপাল ভাঙ্গিল; তাহার স্বামী

মারা পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর শাশুড়ী অলক্ষণা বধূকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া গৃহলক্ষ্মীকে সুস্থির করিল। অলক্ষণা রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের ভাঙ্গা ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু সে ভাঙ্গা ঘরও শীঘ্রই আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল; স্বামীর মরণাশৌচ না যাইতেই তাহাকে মাতা-পিতার মরণাশৌচ ধারণ করিতে হইল। অশৌচাবসানে রোহিণী দেখিল, তাহার সব ফুরাইয়াছে, আছে কেবল একটী দেড় বৎসরের শিশু, সকল অবলম্বন ভাঙ্গিয়াছে; আর সেই অবলম্বনহীনা রোহিণীকে দেড় বৎসরের শিশুটী একটা মস্ত অবলম্বন জ্ঞানে জড়াইয়া ধরিয়াছে। রোহিণীও সেই ক্ষুদ্র শিশুটীকেই সংসারের একটা দৃঢ় অবলম্বন জ্ঞানে বুকে তুলিয়া লইল।

রোহিণীর এত বড় দুঃখটা দেখিয়া প্রতিবাসীরা যে নিশ্চিন্ত ছিল, তাহা নহে। তাহারা আসিয়া রোহিণীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিল, তাহার মৃতপিতার গুণকীর্ত্তন করিল, শেষে কিরূপে তাহার দিন চলিবে সে ভাবনাও ভাবিল। কিন্তু ভাবনার শেষ না হইতেই ধনঞ্জয় চৌধুরীর কন্যার বিবাহের সংবাদ গ্রামে রাষ্ট্র হইল। তখন সকলে অগত্যা রোহিণীর ভাবনা ছাড়িয়া ধনঞ্জয় বাবুর বাটীর উৎসব ও ভোজনাদি ব্যাপারের আলোচনা ও সমালোচনায় মনোনিবেশ করিল।

আর রোহিণী সেই ভগ্ন গৃহদ্বারে বসিয়া, ছোট ভাইটীকে কোলে লইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। ভগবান্—যিনি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি কি আহার দিবেন না? রোহিণী জানিত না যে, সেকালের বিধাতা পুরুষ একালে আর কাহারও জন্য বালি মাপিয়া আহার সংস্থানে প্রবৃত্ত হন না। সে কালের বিধাতা যে পেন্সন লইয়াছেন, আর তাহার পরিবর্ত্তে একালের সভ্যভব্য বিধাতা যে তাহার মত লোকের জন্য বালি মাপা একটা ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম বলিয়া নূতন আইন প্রচার করিয়াছেন,

তাহা রোহিণীকে কেহ বলে নাই। সুতরাং সে বিধাতা পুরুষের বালি মাপার উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

(২)

সংসার রোহিণীকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া আপনার নির্দিষ্ট পথে সমান ভাবে চলিতে থাকিলেও সংসারের একটা লোক কিন্তু রোহিণীকে ছাঁটিয়া ফেলিতে পারিল না। সে সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রোহিণীর ভাবনা ভাবিতে লাগিল। তাহার নাম ভজহরি। ভজহরি লোকটা কিছু অস্বাভাবিক ছাঁচে গড়া। সে মদ খায়, গাঁজা খায়, ধনঞ্জয় বাবুর ছোট ভাই কুমুদ বাবুর সহিত ইয়ারকি দেয়, বাবুর রক্ষিতা স্ত্রীলোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করে। আবার কেহ বিপদে পড়িলে ভজহরি তাহাকে সাহায্য করে, কেহ খাইতে না পাইলে কুমুদ বাবুকে ধরিয়া তাহার খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়, কোন পুরাঙ্গনার উপর কুমুদ বাবুর নজর পড়িলে ভজহরি তাহার রক্ষার জন্য প্রাণপণ করে। ইহাতে কুমুদ বাবু সময়ে সময়ে তাহার উপর বিরক্ত হইতেন, কিন্তু চতুর ভজহরি কৌশলে তাঁহার সে বিরক্তিকে সন্তোষে পরিণত করিত। সংসারে এক মা ছাড়া ভজহরির আর কেহ ছিল না। তাহার বিবাহ হয় নাই, হইবারও বড় একটা সম্ভাবনা ছিল না। কেহ বিবাহের কথা তুলিলে ভজহরি বলিত, "বিবাহ না করিয়া যখন ত্রিশটা বছর কাটিয়া গেল, তখন আর ক'টা দিন ?

রোহিণীর সহিত ভজহরির কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু ভজহরির সম্পর্কবিচারী বড় একটা ছিল না। ভজহরি, রোহিণীকে চরকা আনিয়া দিল, তুলা আনিয়া দিল, প্রস্তুত সূতা বিক্রয় করিয়া দিতে লাগিল। এই আয়ে রোহিণী অতি কষ্টে আপনার ও ছোট ভাইটীর জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু কেবল আহারের সংস্থান করিয়া দিয়াই ভজহরি নিশ্চিন্ত

হইতে পারিল না। সে রোহিণীর জন্য আরও অনেক ভাবিল। রোহিণীর এই বয়স, এত রূপ—সংসারে দুষ্ট লোকের অভাব নাই। তখন ? ভজহরি তো তাহাকে সর্ব্বদা পাহারা দিয়া রাখিতে পারিবে না, সে কোন্ দিন নেশা ভাং করিয়া কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার ঠিকানা নাই। তখন রোহিণীকে কে রক্ষা করিবে ? অসুখে পড়িয়া রোহিণী যদি দুই দিন খাটিতে না পারে, তখন তাহাকে কে খাওয়াইবে ? ভজহরির তো সে সামর্থ্য নাই ? ভজহরি বিষম সমস্যায় পড়িল।

একদিন ভজহরি রোহিণীকে বলিল "রোহিণি, আমার একটা কথা রাখ।"

রোহিণী বলিল, "কি কথা ভজা দাদা ?"

ভজহরি বলিল, "তুমি বিবাহ কর।"

মুখ ফিরাইয়া রোহিণী বলিল, "ছিঃ !"

ভজ। ছিঃ নয় রোহিণি, বিবাহ ছাড়া তোমার আর অন্য উপায় দেখি না।

রো। বিধবার কি আবার বিয়ে হয় ?

ভজ। বিদ্যাসাগরের মত পণ্ডিত ব্যবস্থা দিয়েছেন।

রো। ছাই ব্যবস্থা !

ভজ। ছাই নয় রোহিণি, একবার নিজের অবস্থা ভেবে দেখ, কতদিন তোমায় বাঁচতে হবে মনে কর, সংসারে কত বিপদ থাকতে পারে তা' ভুলে যেও না।

রো। আমি বিপদকে গ্রাহ্য করি না।

ভজ। অন্য বিপদকে গ্রাহ্য না কর ; কিন্তু ধর্ম্ম ?

রো। মরিতে জানি।

ভজ। তারপর ?

রো। তারপর আর কি ?

ভজ। তখন খোকার কি হ'বে ?

খোকা ? সত্যই তো খোকার কি হ'বে ? সে মরিলে খোকাকে কে দেখিবে ? বাপের বংশলোপ—পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড লোপ হইবে ? রোহিণী ভাবিতে লাগিল। খোকা তখন একটা মাটীর পুতুলকে স্বীয় সঙ্গী কল্পনা করিয়া অবাধ্যতা দোষ জন্য তাহাকে শাসন করিতেছিল, কিন্তু সেই জড় সঙ্গীটী কিছুতেই শাসনাধীন না হওয়ায় অবশেষে তাহার মুণ্ডভক্ষণরূপ শাস্তিপ্রদানে উদ্যত হইয়াছিল; রোহিণী তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইল। কুন্দকুসুম দশন বিস্তার করিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে খোকা ডাকিল, "দিদি !"

রোহিণী দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া তাহার কুসুমসুকোমল গণ্ডে চুম্বন করিল। খোকা দুইহাতে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিল। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোহিণী বলিল, "ভজাদাদা—"

ভজ। রোহিণি, তোমার ভজাদাদা তোমাকে দুষ্কর্ম্মের মন্ত্রণা দেয় নাই।

রো। কিন্তু পাঁচজনে কি বল্বে ?

ভজ। পাঁচ জন ? পাঁচ জন কে রোহিণি ? যারা এখন তোমাকে উপবাসী দেখে মুচকি হেসে চলে যায়, তা'রা ?

একটু ভাবিয়া রোহিণী বলিল, "ভজাদাদা, আমায় একটু ভাবতে দাও।"

ভজহরি আর কিছু বলিল না। সেদিন রোহিণী খোকাকে বুকে চাপিয়া অনেক ভাবিল, অনেক কাঁদিল; ইহকাল পরকাল, সুখ দুঃখ, ভজাদাদা, খোকা, আপনি—একে একে অনেক কথা ভাবিল; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

(৩)

একদিন প্রভাতে পচাডাঙ্গা গ্রামখানা সশব্দে জাগিয়া উঠিল। গ্রামের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল লাফাইয়া উঠিল, যুবকেরা হাততালি দিল; বালকেরা তাহাদের রঙ্গ দেখিয়া পাঠশালার কথা ভুলিয়া গেল; মেয়ে মহলেও হাসি তামাসার রোল উঠিল। একজন পাঁচালীর দলের সর্দ্দার গাহিয়া উঠিল,—'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর'—ইত্যাদি। আর রোহিণীর প্রতিবাসীরা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তা কখনই হ'তে পারে না; রূপনাথ দাদার কুলে কালি,—তাঁর বিধবা মেয়ের বিয়ে, এ আমরা প্রাণ থাক্‌তে দেখতে পারবো না।"

তখন পুরোহিত সার্ব্বভৌম মহাশয় ছুটিয়া গিয়া রোহিণীর হাতে পৈতা জড়াইয়া দিলেন; বৃদ্ধেরা ছুটিয়া গিয়া বলিল, "মাগো, তুই রূপনাথের কত আদরের ধন, তোর মুখ দেখলে তার মুখ মনে পড়ে। তুই আমাদের রূপনাথের মুখে কালি দিস্ না, আমাদের মুখটা পোড়াস্ না।"

রোহিণী মরমে মরিয়া গেল; ভাবিল, "ছিঃ ছিঃ, এর চেয়ে মরণ লক্ষ গুণে ভাল।"

ভজহরি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ভগবান্, এদের মুখগুলা সত্যই কবে পুড়বে?"

গোলযোগ থামিয়া গেল; গ্রাম সুস্থির হইল। রোহিণী আবার চরকা কাটিয়া ভাত খাইতে লাগিল।

গোলযোগের ধাক্কাটা কুমুদবাবুর বৈঠকখানা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। কুমুদবাবু একদিন ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ হে, কার আবার বিয়ে দিচ্ছিলে?"

ভজহরি আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল। কিন্তু কথাটা চাপা থাকিল না; অন্যান্য পারিষদগণের মুখে কুমুদবাবু সকল কথাই শুনিলেন।

শুনিয়া তাঁহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ভজহরিকে বলিলেন, "ওহে, আমি বিধবা বিবাহে রাজি আছি।"

পারিষদগণ হাসির ফোয়ারা তুলিল; ভজহরির বুক কাঁপিয়া উঠিল।

ইহার পর ভজহরি সংবাদ পাইল, বাবু একদিন বেড়াইতে গিয়া গোপনে রোহিণীর রূপমাধুরী দেখিয়া আসিয়াছেন, এবং দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে তাহার রূপের প্রশংসা করিয়াছেন। ভজহরি ভাবিল, "ভগবান্, রক্ষা কর।"

(৪)

ইহার পর হইতে রোহিণীর নিকট গয়লা বোয়ের যাতায়াত আরম্ভ হইল; ক্রমে তাহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তাহার এই আগমনের উদ্দেশ্য কি তাহা রোহিণী ভাল বুঝিতে পারিল না। সে না বুঝিলেও পাড়ার লোকেরা ন্যায়ের অনুমানখণ্ডের সাহায্যে তাহা বুঝিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সিদ্ধান্তও করিয়া বসিল। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—যখন রোহিণীর গৃহে ধূমরূপা গোপবধূর আবির্ভাব হইয়াছে, এবং সে যখন কুমুদ বাবুর দূতীরূপে প্রসিদ্ধা, তখন আগুনও নিশ্চয়ই জ্বলিয়াছে; সে আগুন—কুমুদ বাবুর সহিত রোহিণীর একটা অবৈধ আত্মীয়তা। তখন যে যতদূর পারিল, কল্পনার সাহায্যে এই সিদ্ধান্তকে অলঙ্কৃত করিয়া আপনার সদুদ্দেশ্য সাধন করিতে লাগিল; যে না পারিল, সে কেবল শুনিয়াই তৃপ্তিলাভ করিল। ফল কথা, দুই চারিদিনের মধ্যেই সকলে স্থির করিয়া ফেলিল, রোহিণী পাপিষ্ঠা, সে কুমুদ বাবুর বিলাসসঙ্গিনী। সার্ব্বভৌম মহাশয় সবেগে এক টিপ নস্য টানিয়া বলিলেন, "নষ্টস্য কান্যা গতিঃ, এতদ্রূপ না হইলে পুনর্ব্বিবাহার্থ তাহার অভিপ্রেত হইত কেন?"

ভজহরি আসিয়া বলিল, "রোহিণি, এখনও আমার কথা রাখ।"

রোহিণী বলিল "না, আমি বাপ পিতামহের কুলে কালি দিতে পারব না।"

ভজ। গয়লা বৌ কেন আসিতেছে জান?

রো। অনুমানে কতকটা বুঝেছি।

ভজ। তবে এখন কিরূপে রক্ষা পাইবে?

রো। ভগবান্ রক্ষা করিবেন।

ভজ। সব সময়ে কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করিলে চলে না।

রো। যিনি অনাথের নাথ, তাঁর উপর নির্ভর করিতে না শিখিলে অনাথের এক মুহূর্ত্তও চলে না।

ভজহরি নিরুত্তর। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "রোহিণি, আমার বাড়ীতে থাক্‌বে?"

রো। না।

ভজ। কেন?

রো। তাতে আরও কলঙ্ক।

অগত্যা ভজহরি নিবৃত্ত হইল।

(৫)

ভজহরি যে কেবল নিবৃত্ত হইল তাহা নহে, রোহিণীর উপর তাহার বড় রাগও হইল। যে নিজের ভাল মন্দ বুঝে না, বুঝিলেও তাহার মত কাজ করিতে চাহে না, তাহাকে কি রাখা যায়? দূর হউক,—ভজহরি ভাবিল, দূর হউক, রোহিণীর কথা আর ভাবিব না। কিন্তু ভজহরি প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না। কেন পারিল না তাহা ভজহরি নিজেই জানে না, আমরা তাহার কি উত্তর দিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিধাতা তাহাকে একটু অস্বাভাবিক ছাঁচে গড়িয়াছিলেন।

ভজহরি তখন সমাজের মাথা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল, এবং রোহিণীর বিপদের বার্ত্তা জানাইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। সার্ব্বভৌম মহাশয় বহুবিধ শাস্ত্রবচনের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে ন্যায়ান্যায়ের বিচারকর্ত্তা ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পরামর্শ দিলেন; এবং তিনি স্বয়ং রোহিণীকে রক্ষা করিবার সাহায্য করিয়া যে কুমুদ বাবুর বিরাগভাজন হইতে অসমর্থ ইহাও প্রকাশ করিলেন। ভজহরি ধর্ম্মের দোহাই দিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাদাতা সার্ব্বভৌম মহাশয়, কলিকালে ধর্ম্মের গতি কিরূপ সূক্ষ্ম তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভজহরি তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একে একে মুখুজ্যে মহাশয়, ঘোষজা মহাশয়, বোসজা মহাশয় প্রভৃতি অনেক মহাশয়ের নিকট গমন করিল। কিন্তু কোন মহাশয়ই জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সহিত বিবাদকে নীতিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন না। সমাজের ও পাঁচজনের মুণ্ডপাত করিতে করিতে ভজহরি কুমুদ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল।

কুমুদ বাবু তখন একা ছিলেন। সুযোগ পাইয়া ভজহরি বলিল, "আজ আপনাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া কুমুদ বাবু বলিলেন, "বরং বৃণু।"

ভজহরি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "একটা অনাথাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

হাসিতে হাসিতে কুমুদ বাবু বলিলেন, "এ আর বেশী কথা কি? অনাথাকে সনাথা করাই তো আমার কাজ!"

ভজ। এ অনাথাটা কিন্তু অনাথা থাকিতেই ইচ্ছা করে।

কুমু। এমন নির্ব্বোধ অনাথাটা কে হে?

ভজ। রূপনাথ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে রোহিণী।

কুমুদ বাবু হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "এই কথা ! তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটু আগে চারজন লোক পাঠিয়েছি।"

ভজহরি বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল ; রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কুমুদ বাবু !"

কুমুদ বাবু তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "কি হে, এত ব্যস্ত কেন ?

ভজহরি বলিল, "না ছেড়ে দিন, আমার কাজ আছে।"

কুমুদ বাবু বলিলেন, "কাজের মাথায় মার পয়জার ; একটু মিষ্টি-মুখ করে যাও।"

তখনই চাকরের ডাক পড়িল। চাকর আসিল, তাহার সঙ্গে বোতল গ্লাস আসিল। কুমুদ বাবু স্বহস্তে গ্লাস পূর্ণ করিয়া ভজহরির মুখের নিকট ধরিলেন। অগত্যা ভজহরি সেটুকু উদরসাৎ করিল। বাবু নিজেও এক গ্লাস উদরস্থ করিলেন। ভজহরি বলিল, "এবার ছেড়ে দিন, আমি যাই।"

কুমুদ বাবু বলিলেন, "চুপ্ রহো বেতমিজ, যাচা অন্ন মৎ ছোড়ো!"

আবার গ্লাস পূর্ণ হইল, আবার তাহা ভজহরির মুখের নিকট আসিল। ভজহরির এখন একদিকে কর্ত্তব্যের আহ্বান, অন্যদিকে সুরার সাদর সম্ভাষণ। সুরাভক্ত ভজহরি সুরার আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। সুরাসুন্দরীর মোহিনী শক্তির নিকট কর্ত্তব্য পরাজিত হইল।

দেখিতে দেখিতে বোতল শেষ হইল। আবার বোতল আসিল। কিন্তু তাহা শেষ না হইতেই ভজহরি "জয় বাবা জগন্নাথ" বলিয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিল। কুমুদ বাবু তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিলেন।

(৬)

রোহিণী শুইয়াছিল, কিন্তু ঘুমায় নাই। সে দিন একাদশী। সমস্ত দিনের উপবাসে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, কাণের ভিতর সোঁ সোঁ শব্দ উঠিতেছিল, রজনীর স্বাভাবিক স্নিগ্ধতাগুণে তৃষ্ণার বেগটা একটু একটু কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু একেবারে কমে নাই। রোহিণী ঘুমাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঘুম আসিল না, তাহার পরিবর্ত্তে একরাশ চিন্তা আসিয়া তাহার তৃষ্ণাকুল বুকটা জড়িয়া বসিল। রোহিণী ভাবিতেছিল,—"মানুষ কেন জন্মে? দুঃখভোগ করিতে? তবে সে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল দুঃখভোগই করে না কেন? দুই দিনের জন্য সুখের বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া, একটা নিদারুণ অতৃপ্তি—জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়া, অনন্তকালের জন্য তাহাকে দুঃখের গাঢ় অন্ধকারে ডুবাইয়া দেয় কেন? যাহাকে আজীবন প্রচণ্ড মরুবক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে, সে মুহূর্ত্তের জন্য সুশীতল পানীয়ের আস্বাদ পায় কেন? ইহারই নাম কি দুর্ল্লভ মানব জন্ম?—ইহারই নাম কি বিধাতার করুণ সৃষ্টি? তবে এর চেয়ে আর নির্ম্মমতা কোথায় আছে! তবে কি ইহা দয়াময় বিধাতার দয়ার রাজ্যে নির্দ্দয় মানুষের স্বেচ্ছাকৃত অত্যাচার? তবে কি আমি ইচ্ছা করিলেই এ অত্যাচার হইতে—এই নরকযন্ত্রণা হইতে—" রোহিণীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। বুকের উপর পড়িয়া খোকা ঘুমাইতেছিল, রোহিণী তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া অন্ধকারে তাহার নিদ্রালস মুখখানি চুম্বন করিল।

তোমরা রোহিণীর উপর রাগ করিও না। রোহিণী বড় দুঃখিনী; সে কেবল দুঃখভোগ করিতেই শিখিয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য তো শিখে নাই? সে শিক্ষা তো তাহাকে কেহ দেয় নাই।

সহসা বাহিরের দরজায় আঘাত পড়িল। রোহিণী ভাবিল, ভ্রম।

কিন্তু ভ্রম নয়,—আবার আঘাত, আবার আঘাত; ধীরে নয়, সবলে আঘাত। রোহিণীর বুক গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল; গয়লাবোয়ের ভয় প্রদর্শন, ভজাদাদার সতর্কতা, সব তাহার মনে পড়িল। ঘর অন্ধকার; খোকা গলা জড়াইয়া বুকের উপর শুইয়া আছে। খোকাকে বুকে চাপিয়া রোহিণী উঠিল। ঘরের দরজা খুলিল; বাহিরে আসিয়া আবার একবার কাণ পাতিয়া শুনিল। শুনিয়া বুঝিল, দুই একজন নয়, অনেক লোক মিলিয়া দরজায় আঘাত করিতেছে। ভাঙ্গা বাড়ীর ভাঙ্গা দরজা, কতক্ষণ টিকিবে? দরজা বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িল। কাঁপিতে কাঁপিতে রোহিণী উঠানে নামিল। তার পর খিড়কীর দরজা খুলিয়া বাড়ীর বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে সদর দ্বার মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে শব্দ রোহিণীর কাণে গেল। সে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া ছুটিল। কিন্তু ছুটিবার সঙ্গেই খোকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে কাঁদিয়া উঠিল। কান্নার শব্দ দস্যুদের কাণে গেল। তাহারা তখন হো হো শব্দে রোহিণীর অনুসরণ করিল। লুব্ধক-তাড়িতা হরিণীর ন্যায় রোহিণী রুদ্ধশ্বাসে ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে রোহিণী চীৎকার করিয়া ডাকিল; "রক্ষা কর, ওগো রক্ষা কর।" স্তব্ধ নৈশগগন ভেদ করিয়া প্রতিধ্বনি উঠিল, "রক্ষা কর, রক্ষা কর।" সে প্রতিধ্বনিতে সমস্ত গ্রামখানা কাঁপিয়া উঠিল। সে শব্দ যাহার কাণে গেল, সেই সবলে গৃহদ্বার রোধ করিল।

বাহিরে পরিষ্কার জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নাই রোহিণীর শত্রু হইল, পাষণ্ডগণ তাহার অনুসরণ করিবার সুযোগ পাইল। অন্ধকার—ভগবান্! প্রলয়ের গাঢ় অন্ধকারে বিশ্ব ঢাকিয়া দাও; সে অন্ধকারের কোলে লুকাইয়া রোহিণী আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু মানুষের বিপদে বিধাতার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় না।

রোহিণী আর ছুটিতে পারে না; ছুটিবার উপায়ও নাই। সম্মুখে

খরস্রোতা নদী। রোহিণী দাঁড়াইল; একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল; দেখিল, পাষণ্ডের দল অতি নিকটে, বিশ পঁচিশ হাত মাত্র দূরে। রোহিণী চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ভগবান্!" তার পর খোকাকে বুকে চাপিয়া সেই তরঙ্গিণীর খরস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

পরদিন আধক্রোশ দূরে নদীর চড়ায় একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। রমণীর বুকের উপর একটি শিশু; শিশু তখনও দৃঢ়বেষ্টনে রমণীর গলা জড়াইয়া রহিয়াছে।

পচাডাঙ্গার অনেকেই আসিয়া লাস সনাক্ত করিল। সকলেই চিনিল, এ রমণী মৃত রূপনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা রোহিণী। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও লাস সনাক্ত করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ; যেমন পাপ তেমনি প্রায়শ্চিত্ত!"

ভজহরির তখন নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"সার্ব্বভৌম মহাশয়! রোহিণী কাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল?"

তাহার কথার কেহ উত্তর দিল না। তোমরা কেহ দিতে পার কি?

রাঙা কাপড়ের মূল্য

(১)

"ওমা আমি আঙা কাপল্ পল্‌বো,—আমি আঙা কাপল্ পল্‌বো।"

চারিদিকে পূজার ঢাকের শব্দ উঠিয়াছে, পাশের বাড়ীতে প্রতিমার গায়ে রং পড়িতেছে, গ্রামের ছোট বড় ছেলে মেয়ে রং বেরংএর নূতন কাপড় পরিয়া ঠাকুর দেখিতে ছুটিয়াছে; আর চারি বৎসরের বালক সতীশ মাতার অঞ্চল টানিতে টানিতে বলিতেছে, "ওমা আমি আঙা কাপল্ পল্‌বো—আমি আঙা কাপল্ পল্‌বো।"

মা বলিলেন, "ছি বাবা, আমি রাঙা কাপড় কোথায় পাব? তুমি যে লক্ষ্মী ছেলে।"

ছেলে সে কথা শুনিল না; ক্রন্দনের সুরে বলিল, "কেন, বলা আঙা কাপল্ পলেছে, মিনা পলেছে, সুদা পলেছে, তুই আমাকেও আঙা কাপল্ দে।"

মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তারা যে বড় লোক, আমরা যে গরীব বাবা।"

ছেলে মাথা সরাইয়া লইয়া বলিল, "তা হোক, তুই আমাল কাপল দে।"

মা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কত ভুলাইলেন, সময়ে সময়ে নিজেই যাহা বুঝিতে পারেন না, এমন অনেক উপদেশপূর্ণ কথায় চারি বৎসরের শিশুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছেলে সে সকল কথার কিছুই

বুঝিল না, ভবিষ্যতে লভ্য শত প্রলোভনেও 'আঙা কাপলের' বায়না ছাড়িল না। শেষে মা ভয় দেখাইলেন, ধমক্ দিলেন, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, "আমায় আঙা কাঁপল্ দে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বুকের উপর সবলে হাত পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। মার আর সহ্য হইল না; "হতভাগা ছেলে" বলিয়া তিনি পুত্রের নবনীত-সুকোমল পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন। ছেলে যাতনায় "ও মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। খানিক কাঁদিয়া শেষে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, মার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া ফোঁপাইতে লাগিল। মাতার দর-প্রবাহিত অশ্রুধারা তাহার আঘাত-রক্তিম পৃষ্ঠদেশ সিক্ত করিতে লাগিল।

ছেলেকে শোয়াইয়া মা পাশে শুইলেন। ফুলিতে ফুলিতে ছেলে ঘুমাইয়া পড়িল। সুপ্তাবস্থাতেও তাহার কচি কচি ঠোঁট দুইটী থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মাতা সেই স্ফীত রক্তিম অধরে একটী চুম্বন করিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "কোথায় তুমি, একবার এস, তোমার সোণার সতু আজ একখানা নূতন কাপড়ের ভিখারী। আমি যে আর তাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারি না।"

ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, সে অশ্রুপ্রবাহে নিদ্রিত সতুর কুঞ্চিত কেশরাজি সিক্ত হইতে থাকিল।

(২)

শ্রীনাথ সরকার ও গোপীনাথ সরকার দুই ভাই। শ্রীনাথ অপেক্ষা গোপীনাথ ছয় বৎসরের ছোট। গোপীনাথের বয়স যখন একাদশ বৎসর, তখন তাহাদের পিতা ও মাতা কয়েক মাসের ব্যবধানে ইহলোক ত্যাগ করিল। বাড়ীতে আর কোন অভিভাবক বা অভিভাবিকা ছিল না। সুতরাং গোপীনাথকে পাঠশালা ত্যাগ করিয়া গৃহমার্জ্জন, রন্ধন প্রভৃতি গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। শ্রীনাথ তাস খেলিয়া, গল্প করিয়া দিন

কাটাইতে লাগিল। পিতা কিছু জমিজমা রাখিয়া গিয়াছিল, তদ্দারা কষ্টে সৃষ্টে দুইটা পেট চলিতে পারে।

এই ভাবে দুই তিন বৎসর চলিয়া গেল। একদিন গোপীনাথ, শ্রীনাথকে ধরিয়া বসিল; বলিল, "দাদা, এমন ক'রে বেড়ালে ক'দিন চল্‌বে? একটা কিছু কাজ কর্ম্ম কর।"

শ্রীনাথ বলিল, "কি কাজ কর্‌ব, চাকরী? জানিস্ তো, আমি লেখা-পড়ার ধারও ধারি না।"

গোপীনাথ বলিল, "চাকরী কেন? একখানা দোকান করি এস।"

শ্রীনাথ। দোকান? টাকা কোথায়?

গোপী। জমি দু'বিঘে বেচ না।

শ্রীনাথ। তা যেন হ'ল, কিন্তু দোকান চালাবে কে?

গোপী। কেন, তুমি চালাবে।

হাসিতে হাসিতে শ্রীনাথ বলিল, "তা হ'লেই হয়েছে। আমার ভাই ওসব বুদ্ধি মোটেই আসে না।"

গোপী। তা' না হয় আমিই চালাব, তুমি সংসার দেখ্‌বে।

শ্রীনাথ। তা' দেখ্‌তে পারি, কিন্তু রান্না আর বাসন মাজার কাজটা আমা হ'তে হবে না।

গোপী। না হয় আমা হ'তেই হবে। তুমি এক আধবার দোকানে গিয়ে বস্‌তে পার্‌বে না?

শ্রীনাথ। তা খুব পার্‌ব।

তাহাই হইল। আড়াই বিঘা জমি তিনশত টাকায় বিক্রয় করিয়া গোপীনাথ বাজারে দাদার নামে একখানা মুদিখানার দোকান খুলিল।

গোপীনাথ রাত্রি থাকিতে উঠিয়া গৃহমার্জ্জনাদি প্রাভাতিক কার্য্য শেষ করিয়া দোকানে গিয়া বসিত। মধ্যাহ্নে শ্রীনাথ গিয়া একবার

দোকান দেখিত, গোপীনাথ আসিয়া রাঁধাবাড়া করিত। সে সময়ে খরিদদারের বড় একটা ভিড় থাকিত না, স্থতরাং শ্রীনাথকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। গোপীনাথ নিজে খাইয়া দাদার ভাত চাপা দিয়া দোকানে যাইত, শ্রীনাথ আসিয়া ভাত খাইয়া তাস খেলিতে বাহির হইত। রাত্রিতে গোপীনাথ দোকান বন্ধ করিয়া আসিয়া রন্ধনাদি করিত।

গোপীনাথের ব্যবসায়-বুদ্ধি যেমন প্রখর, তেমনই তাহার হৃদয় সাধুতায় পূর্ণ। স্থতরাং তাহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তুই তিন বৎসরের মধ্যে দোকানখানি বেশ একটু উন্নতি লাভ করিল। গোপীনাথ তখন শ্রীনাথকে বলিল, "দাদা, মেয়ে মানুষ না থাক্‌লে বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করে, তুমি একটা বিয়ে কর।"

শ্রীনাথ বলিল, "না ভাই, সে আবার এক মহা ঝঞ্ঝাট; আমরা তু'ভায়ে বেশ আছি। একটা পরের মেয়ে এলে তাকে আবার দেখবে কে?"

"আমি দেখ্‌ব" বলিয়া গোপীনাথ দাদার বিবাহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল, এবং তুই তিন মাসের মধ্যেই তুইশত টাকা কন্যাপণ দিয়া একটী নয় বৎসরের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ বালিকাকে বধূরূপে ঘরে আনিল।

গোপীনাথের আবার একটা কাজ বাড়িল। নূতন বউটীকে দেখাশুন' তাহাকে খাওয়ান, নাওয়ান প্রভৃতি কার্য্যেই দিবসের অনেকটা সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল, স্থতরাং দোকানে যাওয়া তাহার বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না। শ্রীনাথই দোকান চালাইত, গোপীনাথ নববধূ সৌদামিনীর পরিচর্য্যা করিত, পাকা গৃহিণীর মত তাহাকে সংসারের কাজ, গৃহিণীপণা সব শিখাইত। তাহার যত্নে সৌদামিনীর দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাহার অর্দ্ধোদরব্যাপী প্লীহাটী ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া আসিল, উদরের স্ফীতি কমিল, পঞ্জরের অস্থিমালা, ও হস্তপদের নীলশিরা

ঢাকা পড়িল। ক্রমে প্লীহাজীর্ণা শীর্ণকায়া সৌদামিনী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী ও দ্বাদশবর্ষীয়া হইয়া গৃহিণীর উচ্চ পদ অধিকার করিয়া বসিল। গোপীনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া আবার দোকানে ফিরিয়া আসিল।

(৩)

দোকানে গিয়া গোপীনাথ দেখিল, দোকানের অবস্থা শোচনীয়। ঘরে মাল নাই, বাক্সে টাকা নাই, খাতায় রীতিমত জমাখরচ নাই। অনেক টাকা বিলাত পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশেরই আদায়ের সম্ভাবনা নাই। গোপীনাথ দাদাকে বলিল, "একি, এমন হইল কেন?"

শ্রীনাথ বলিল, "আমি তো আগেই বলেছি ভাই, আমা হ'তে এ কাজ চল্‌বে না।"

গোপী। এখন উপায়?

শ্রীনাথ। উপায় তুমিই জান।

গোপীনাথ অনেক ভাবিয়া বলিল, "দোকান রাখ্‌তেই হ'বে। বৌয়ের গয়নাগুলা এনে দাও।"

শ্রীনাথ বলিল, "আমার কর্ম্ম নয়, তুমি নিজে দেখ।"

"আমিই দেখ্‌ছি" বলিয়া গোপীনাথ ঘরে গিয়া সৌদামিনীর নিকট তাহার গহনা চাহিল। সৌদামিনী গহনা চাহিবার প্রয়োজন কি জানিয়া লইয়া গহনা দিতে অসম্মত হইল। গোপীনাথ অনেক বুঝাইল, অনেক অনুনয় করিল, শেষে ধমক্ পর্য্যন্ত দিল, কিন্তু সৌদামিনী গহনা দিল না। গোপীনাথ দেখিল, সৌদামিনী এখন আর সেই নয় বৎসরের বালিকা নয়, সে এখন এই গৃহের গৃহিণী, কর্ত্রী। গোপীনাথ বিষণ্ণচিত্তে তথা হইতে ফিরিল। কিন্তু এই বিষণ্ণতার মধ্যেও যেন একটু আনন্দ কোথা হইতে উঁকি দিতেছিল। এ আনন্দ বুঝি চেষ্টার সাফল্যজনিত। যে ক্ষুদ্র বিশুষ্কপ্রায় লতাটীকে জলসিঞ্চনে প্রাণপণযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছি, বসন্ত-

সমীরস্পর্শে তাহার সগর্ব্ব আন্দোলন দেখিলে বুঝি এমনই একটা আনন্দের আবির্ভাব হয় ; যে মাতৃহারা সদ্য অণ্ড-নির্গত কপোতশিশুটীকে আপনার মুখে করিয়া ভক্ষ্য দিয়া বাঁচাইয়াছি, বড় করিয়াছি, তাহাকে স্ফীতকণ্ঠে গর্জ্জন করিতে শুনিলে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, ইহাও বুঝি তাহাই।

গোপীনাথ ধারকর্জ্জ করিয়া বহুকষ্টে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া, দ্বিগুণ অধ্যবসায়ের সহিত পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। প্রত্যূষে বাহির হইয়া যাইত, মধ্যাহ্নে একবার মাত্র খাইতে আসিত ; কোন দিন তাহাও আসিত না, একেবারে রাত্রিতে দোকান বন্ধ করিয়া আসিয়া খাইত। শ্রীনাথ এজন্য সময়ে সময়ে তাহাকে ভৎর্সনা করিত, অসুখের ভয় দেখাইত, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গোপীনাথ তাহাতে কাণ দিত না। দোকানের উন্নতিই তাহার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হইয়াছিল।

"সাধিলেই সিদ্ধি" গোপীনাথ এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিল। চারিবৎসর পরে তাহার ছয় শত টাকা মূলধন ছয়সহস্রে পরিণত হইল, এবং সেই ক্ষুদ্র মুদিখানাটী এক বৃহৎ আড়তের আকার ধারণ করিল। শ্রীনাথ ধুমধামের সহিত ভ্রাতার বিবাহ দিয়া দ্বাদশবর্ষীয়া বধূ যামিনীকে ঘরে আনিল।

যামিনা রূপে গুণে অতুলনীয়া ছিল। সৌদামিনী ব্যতীত সকলেই তাহার প্রশংসা করিত।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে শ্রীনাথের অনেক সাংসারিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। পুরাতন বাড়ীখানি নব সুসজ্জিত গৃহে শোভিত হইল, খিড়কী পুকুরের সংস্কার হইল ; তাহার চারি পাড়ে কলা বাগান ও ফুলবাগান উদরপরায়ণ বানরকুঞ্জের কিচিমিচি ধ্বনিতে এবং কুসুমলোলুপ কুসুমপ্রফুল্ল বালিকা-

বৃন্দের কলহাস্যে মুখরিত হইতে লাগিল। গৃহদেবতা শ্রীধরের পতনোন্মুখ মৃণ্ময় গৃহখানি সুধাধবলিত ইষ্টকালয়ে পরিণত হইল; আর সৌদামিনী একটী পুত্র ও একটী কন্যা এবং যামিনী একটী পুত্র উপহার দিয়া সংসারোদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিল। কিছু জমি-জমাও কেনা হইল। কিন্তু সে সকলই সৌদামিনীর নামে। শ্রীনাথ ভ্রাতাকে বুঝাইল, "কারবারের কথা বলা যায় না। ঈশ্বর না করুন, যদি তেমনই ঘটে, তবে মহাজনে সব বেচে কিনে নিতে পারবে না।"

গোপীনাথ ইহাতে কোন আপত্তি করিল না; মনে মনে ভাবিল, "দাদার বুদ্ধিটা চিরকালই কেমন এক রকম। মহাজনকে ফাঁকী দেবার চেষ্টা করলে কারবার চল্‌বে কেন?"

গোপীনাথ বুঝিতে পারে নাই যে, এই বুদ্ধিটা শ্রীনাথের নিজস্ব নহে, সৌদামিনী ইদানীং আপনার বুদ্ধির কিছু কিছু শ্রীনাথকে ধার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শ্রীনাথ আপনার হৃদয়ের সরলতাটুকু বন্ধক দিয়া পত্নীর নিকট এই ঋণ গ্রহণ করিতেছিল।

(৪)

সৌদামিনী হস্তধৃত হারছড়াটী দোলাইতে দোলাইতে বলিল, "আমি বাজি রেখে বল্‌ছি, হার কিন্‌তে ঠাকুরপোর কাছ থেকে তুমি এক পয়সাও পাবে না।"

শ্রীনাথ বলিল, "আর বাজি রাখ্‌তে হবে না; আমি এখনই এক কথায় টাকা এনে দিচ্চি।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া সৌদামিনী বলিল, "এমনই লক্ষ্মণ ভাই বটে।"

শ্রীনাথ। তুমি গোপীকে চেন না।

সৌদা। আমি অনেক দিন চিনেছি, এবার তুমিও চিন্‌বে। এতো আর ছোট বোয়ের গয়না কেনা নয়?

"ভাল, দেখা যাবে" বলিয়া শ্রীনাথ প্রস্থান করিলেন।

সৌদামিনীর কথাই ঠিক হইল ; গোপীনাথ এ সময়ে হার কিনিবার জন্য টাকা দিতে রাজি হইল না। বলিল, "সাম্‌নে চৈত্রের আখেরী কিস্তী ; মহাজনের পাই পয়সা পর্য্যন্ত চুকিয়ে দিতে হবে। এখন তিন শত টাকা দিতে পারা যায় না। বোশেখের শেষ নাগাদ দেখা যাবে।"

শ্রীনাথ দেখিল, সৌদামিনীর কথাই সত্য ; গোপীনাথ তাহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছে। রাগে ফুলিয়া শ্রীনাথ বলিল, "উত্তম, আজ হ'তে আমি নিজে কারবার দেখ্‌ব, আমাকে হিসাব-পত্র কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দাও।"

গোপীনাথ একবার জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া চাবি ফেলিয়া দিল।

সৌদামিনীর মনোরথ সিদ্ধ হইল। দুই তিন মাসের মধ্যেই বাড়ী-ঘর ভাগ হইয়া গেল, উঠানের মাঝখানে প্রাচীর উঠিল। কারবারের ভাগ হইল না। শ্রীনাথ বলিল, "ভাগ হ'লে কারবার নষ্ট হ'য়ে যাবে। আমার নামেই কারবার থাক্, তুমি মাসে মাসে কিছু কিছু পাবে।"

গোপীনাথ তাহাতেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "আর জমি-জমা ?"

শ্রীনাথ। পৈতৃক জমির ভাগ পাবে।

গোপী। নূতন খরিদা জমি ?

শ্রীনাথ। যার নামে আছে সেই পাবে। পার, নালিশ ক'রে আদায় কর।

গোপীনাথ সহাস্যে বলিল, "দাদা, এই তিন কড়ার বিষয়ের জন্য তোমার নামে নালিশ কর্‌ব ?"

গ্রামের অনেকেই গোপীনাথকে পরামর্শ দিল, "নালিশ ক'রে কারবার চুলচেরা ভাগ ক'রে লও।" গোপীনাথ উত্তর করিল, "কারবারের জন্য

আমার বুকের অনেক রক্ত ঢেলেছি, সে রক্তে উকীল-মোক্তারদের পেট ভরাতে পারব না।"

যামিনী বলিল, "এতটা বিষয় এক কথায় ছেড়ে দিলে?"

ঈষৎ হাসিয়া গোপীনাথ বলিল, "রাধা গয়লাকে তো ছেড়ে দিই নাই, বড় ভাইকে দিয়েছি। ভেব না, বরাতে থাকে, আবার হ'বে। কি বল সতু?"

সতু ওরফে সতীশ পিতার গলা জড়াইয়া খল্ খল্ হাসিয়া উঠিল।

গোপীনাথ-মুখে যতটা প্রসন্নতা দেখাইতে চেষ্টা করিত, অন্তরে ততটা প্রসন্নতা আসিত না। এতদিনের পরিশ্রমের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। ইহার উপর বর্ত্তমান অন্নচিন্তা। পত্নী-পুত্রকে যে কি খাওয়াইবে, তাহার উপায় নাই। পৈতৃক তিন বিঘা সাড়ে সাত কাঠা জমির অর্দ্ধাংশ মাত্র ভাগে পাইয়াছে।

গোপীনাথ চিন্তাসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। কখন ভাবিত, যাক্ না সেই আমি ত আছি; আবার খাটিব, আবার উন্নতি করিব। কিন্তু আর সে শক্তি কোথায়? সে অদম্য উৎসাহ কৈ? জগতের অবিশ্বাস ও ও অকৃতজ্ঞতা আসিয়া তাহার হৃদয়ে যে আঘাত করিয়াছে, তাহাতে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে গোপীনাথ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইল। বিনা চিকিৎসায়, দুর্ভাবনায় রোগ ক্রমে কঠিন আকার ধারণ করিল। ক্রমে তাহা জ্বরাতিসারে পরিণত হইল। যামিনী আপনার গহনাপত্র বন্ধক দিয়া, বেচিয়া স্বামীর চিকিৎসা করাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিন মাস রোগ-যন্ত্রণা-ভোগের পর, পত্নীপুত্রকে এক প্রকার পথে বসাইয়া গোপীনাথ প্রতারণাপূর্ণ অকৃতজ্ঞ সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। যামিনী শিশুপুত্র লইয়া দুঃখ ও দারিদ্র্যের সাগরে ভাসিল।

(৫)

শরতের স্বর্ণাভ প্রভাতরশ্মি শ্যাম বৃক্ষাগ্র রঞ্জিত করিয়া, দূর্ব্বাশিরে নীহারের মুক্তাবিন্দু দোলাইয়া, চারিদিকে উৎসবের নবীন আলোক ছড়াইয়া দিতেছিল। ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া পল্লীর দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়াইতেছিল,—

গিরি মনে আছে এই বাসনা।
এবার জামাতা সহিতে আনিব দুহিতে
গিরিপুরে করব শিবস্থাপনা॥

গানের তালে তালে জননীহৃদয়ের আশা, স্নেহ, প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া মধুর শারদ প্রভাতকে মধুরতর করিয়া তুলিতেছিল।

শ্রীনাথ এ বৎসর নূতন পূজা আনিয়াছে। বেশ ধুমধামের সহিত পূজার আয়োজন হইতেছে। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা চিত্রিত হইতেছে। ঠাকুর দেখিবার জন্য এক পাল ছেলে আসিয়া জুটিয়াছে; তাহাদের হাস্য কোলাহলে বহির্বাটী মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। এক পাশে একটী পাঁচ-বৎসরের বালক ছিন্ন মলিন বাসে কটিদেশ আবৃত করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে গোপীনাথের পুত্র সতীশ।

শ্রীনাথ চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে বালক-দলের আনন্দ উৎসব দেখিতেছিল, আর অনেক নামজাদা ঘরের ছেলেকে ঠাকুর দেখিবার জন্য তাহার প্রাঙ্গণে সমাগত দেখিয়া মনে মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিতেছিল। এমন সময় শ্রীনাথের দ্বিতীয় পুত্র বলাই নববস্ত্র সজ্জিত হইয়া আসিয়া সতীশের পাশে দাঁড়াইল, এবং আপনার নূতন কাপড় দেখাইয়া বলিল, "সতু, তোর নোতুন কাপড় নেই।"

সতীশ আপনার মলিন বস্ত্রের এক প্রান্ত তুলিয়া বলিল, "এই যে আমাল কাপল।"

বলাই বলিল, "ওতো ছেঁড়া ; এই দেখ্‌ আমার নোতুন কাপড় ।"

সতীশের মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে একবার আপনার ছিন্ন মলিন বস্ত্রের দিকে, আরবার বলায়ের নব বস্ত্রের দিকে চাহিয়া নীরবে রহিল। বলাই তখন করতালি দিয়া বলিল, "দুও, তোর নোতুন কাপড় নেই।" সঙ্গে সঙ্গে সমবেত বালকবৃন্দ করতালি দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দুও, দুও!"

সতীশের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। সেই জলভরা চোখে সে একবার জ্যেষ্ঠতাতের মুখের দিকে চাহিল। শ্রীনাথ দেখিল, বালকের সে দৃষ্টি কি করুণ, কি আকুলতাপূর্ণ! সে দৃষ্টি তাহার মর্ম্মস্থলে গিয়া একটা তীব্র আঘাত করিল।

সতীশ এই বিদ্রূপপ্রিয় বালকদলের মধ্যে আপনাকে নিতান্ত অসহায় জ্ঞান করিয়া, দুই হাতে চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে চলিয়া গেল। বলায়ের সহিত বালকগণ 'দুও দুও' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্রীনাথ ভ্রূকুটি করিয়া রোষ-কটাক্ষে বলায়ের দিকে চাহিলে বলাই ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। বালকগণও নিস্তব্ধ হইল।

(৬)

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় যখন বাহিরে অধিবাসের বাজনা বাজিতেছিল, তখন শ্রীনাথ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসিল, "ছোট বৌমা কেন এসেছিল ?"

সৌদামিনী ভাঁড়ার ঘরে চাবি দিতে দিতে বলিল, "কেন আবার ? এসেছিলেন একটু দুধ চাইতে। আমার ঘরে যেন সাতটা গাই বিইয়েছে।"

শ্রীনাথ। তা' দুধ দিলে না কি ?

সৌদা। কোথা পাব যে দেব? যা দুধ হয়, আমারই ছেলেদের খেতে কুলায় না।

শ্রীনাথ। তা' আমি জানি। কিন্তু এমন সময়ে দুধ চাইতে এল কেন?

সৌদা। বলে—ছেলেটার জ্বর হয়েছে। তা' জ্বর হয়েছে তো বাজারে কি দুধ নাই? পোড়া লোকের জ্বালায় গেলাম।

শ্রীনাথ। একটু উৎকণ্ঠার স্বরে বলিলেন, সতীশের জ্বর হয়েছে? কবে জ্বর হ'ল?

সৌদামিনী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "অত খবর রাখ্‌বার আমার সময় নাই। ছেলেগুলো এখনও খেতে পায় নি।"

সৌদামিনী সৌদামিনী-বেগে অন্তর্হিত হইল।

অদূরে ক্ষান্তর মা বসিয়া ডাউল বাছিতেছিল। সে বলিল, "শুন্‌ছি ছেলেটার বড্ড ভারি ব্যারাম, বিকার হয়েছে, কেবল আবোল-তাবোল বক্‌ছে। হারু কবরেজ এসেছিল, ব'লে গেছে, বাঁচে কি না সন্দেহ।"

শ্রীনাথ স্থিরভাবে দাড়াইয়া কথাগুলা শুনিল; তারপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরপদে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন পুরোহিত বিল্বমূলে বসিয়া উদাত্তস্বরে দেবীর আবাহন-মন্ত্র পাঠ করিতেছেন,—

"আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে।"

শ্রীনাথ সেখানে দাঁড়াইল না; ধীরে ধীরে গোপীনাথের বাড়ীতে প্রবেশ করিল; ধীরে কম্পিতপদে স্পন্দিতবক্ষে শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, কি করুণ দৃশ্য!

ছিন্ন মলিন শয্যা, তদুপরি ছিন্ন শতদলবৎ সতীশের ক্ষীণ দেহ-লতা বিলুণ্ঠিত। শীর্ষদেশে রুক্ষকুন্তলা শতছিন্নবাসা যামিনী দাবানলস্পৃষ্টা লতিকার মত পুত্রের রোগক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

ক্ষীণ দীপশিখা নাচিয়া নাচিয়া ছায়ালোকে গৃহমধ্যে মৃত্যুবিভীষিকা বিস্তার করিতেছে। সতীশের চৈতন্য নাই; সে কখন বিকারের ঘোরে আপনার মাথার চুল ধরিয়া টানিতেছে, কখন অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে, কখন বিছানার চারিদিকে গড়াগড়ি দিতেছে। যামিনী তাহাকে শয্যার যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া, তাহার শীর্ণ অধরে অধর সংলগ্ন করিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছে—"সতু, সতু, বাপ আমার!" সতু মাতার সে আকুল কণ্ঠের করুণ আহ্বান শুনিতেছে না; সে রক্ত চক্ষু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, শীর্ণ অঙ্গুলি উপর দিকে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "আঙা কাপল্,—আমি আঙা কাপল্ নেব।"

যামিনী অশ্রুধারায় পুত্রের মস্তক সিক্ত করিয়া বলিল, "সতু, আমার সোণার সতু, আমি সর্ব্বস্ব বেচে তোকে রাঙা কাপড় পরাব।"

সতু চীৎকার করিয়া বলিল, "আঙা কাপল, আঙা কাপল; ও মাগো, আমি আঙা কাপল পল্‌ব।"

শ্রীনাথ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধীরে ধীরে কক্ষের বাহিরে আসিল।

সেই রাত্রিতে ডাক্তার আসিল, ঔষধ চলিল, কিন্তু সতীশের রোগ কমিল না, তাহার "আঙা কাপলের" প্রলাপ-চীৎকার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

সপ্তমী পূজা শেষে সকলে দেবীর পদে অঞ্জলি দিল, কিন্তু শ্রীনাথ দিল না। সে তখন কোথা হইতে একতাড়া কাগজ হাতে লইয়া বাড়ীতে আসিল, এবং ঘরে ঢুকিয়া বাক্স খুলিতে লাগিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সৌদামিনী ঘরে আসিয়া বলিল, "ওমা, তোমার এখনও নাওয়া হয় নি, কি ঘেন্না!"

শ্রীনাথ কোন উত্তর না করিয়া বাক্স হইতে কতকগুলা নোট ও টাকা বাহির করিল। সৌদামিনী বলিল, "টাকা এখন কি হবে?"

শ্রীনাথ গম্ভীর স্বরে বলিল, "ডাক্তার খরচ।"

সৌদা। আর কাগজগুলা ?

শ্রীনাথ। বিক্রয় কবালা।

সৌদামিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না। সে অগ্রসর হইয়া কাগজ ও নোটের একপ্রান্ত চাপিয়া ধরিল ; বলিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ ? আমি দিব্যি ক'রে বল্‌তে পারি ও বাঁচ্‌বে না। টাকাগুলা কেন জলে ফেল্‌ছ ?"

সৌদামিনীকে সবলে ঠেলিয়া দিয়া শ্রীনাথ ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। সৌদামিনী পড়িয়া গেল ; বাক্সের কোণ লাগিয়া তাহার মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শ্রীনাথ সেদিকে ফিরিয়া চাহিল না।

শ্রীনাথ ছুটিয়া গিয়া সতীশের রোগশয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন রোগীর নিশ্বাস বড় জোরে বহিতেছে, কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ; সেই ক্ষীণ কণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে সতীশ এক একবার বলিতেছে—আঙা কাপল !

উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া শ্রীনাথ ডাকিল, "সতু, সতু !"

সতীশ কষ্টে একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল ; ভগ্ন অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "আঙা কাপল !"

শ্রীনাথ বলিল, "এই তোর রাঙা কাপড়ের দাম ! আজ হ'তে সব বিষয় তোর।"

শ্রীনাথ সতীশের হাতে কাগজগুলি দিতে গেল, কিন্তু সতীশ আর সে কাগজ লইল না। পুত্রহারা জননীর আর্ত্ত চীৎকারে পূজার আনন্দ-কোলাহল—উচ্চ বাদ্যধ্বনি বিলীন হইয়া হইয়া গেল।

সঙ্গিহারা
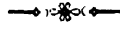
(১)

সংসারে হরিদাস একা—চিরদিনই একা ; কখন যে তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল, তাহা সে জানে না। লোকে বলে, তাহার মা বাপ ছিল, একটী ভগ্নী ছিল, দূরসম্পর্কীয়া এক বৃদ্ধা দিদিমা ছিল। কিন্তু হরিদাস লোকের এ কথায় বিশ্বাস করিত না। সে ভাবিত, যেমন মেঘমালার মধ্য হইতে এক এক সময়ে অজস্র করকারাশি পতিত হয়, তেমনই সে হয় তো একদিন ঐ করকারাশির সহিতই এই নূতন গঞ্জ গ্রামখানির মধ্যে পতিত হইয়াছে, এবং যে প্রাকৃতিক নিয়মে মীনশিশু বা সর্পশিশু লালিত-পালিত হইয়া থাকে, সেও সেই নিয়মে লালিত-পালিত হইয়া আসিয়াছে।

হরিদাস না জানিলেও আমরা জানি, এক সময়ে তাহার মা ছিল, বাপ ছিল, একটী তিন বৎসরের ভগ্নী ছিল। হরিদাসকে প্রসব করিবার কয়েক দিবস পরে সূতিকাগারেই মাতা তাহাকে ছাড়িয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে। তাহার পাঁচমাস পরে ম্যালেরিয়ার প্রবল পীড়নে মাতৃহীনা বালিকা মাতার অনুসরণ করে। শোকাতুর মদনদাস বহুকষ্টে মাতৃক্রোড়-বিচ্ছিন্ন শিশুটীকে পালন করিতে থাকে। কিন্তু এক বৎসর না যাইতেই কালের ডাকে সেও অনাথ শিশুটিকে একা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

তারপর হরিদাসের মাতার মাতুলানী আসিয়া তাহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করে। তাহার পালনে নানা অভাব ও অনাদরের মধ্য দিয়া সে যখন পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিল, তখন বৃদ্ধারও কালের ডাক পড়িল ;

হরিদাসের হাতে এক গণ্ডূষ জল পান করিয়া বৃদ্ধা হরিনাম করিতে করিতে নয়ন মুদ্রিত করিল। তাহার পলিত লোল ভ্রূযুগলের বিষম বিকৃতি এবং কোটরগত চক্ষুর্দ্বয়ের একটা তীব্রশাসনপূর্ণ দৃষ্টি ব্যতীত হরিদাসের আর কিছুই মনে রহিল না।

বৃদ্ধার মৃত্যুর পর প্রতিবেশিগণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া হরিদাস জীবনধারণ করিতে লাগিল। কতবার রোগে তাহার জীবন সংশয় হইয়াছে ; চিকিৎসা নাই, শুশ্রূষা নাই, তথাপি হরিদাস বাঁচিয়া উঠিয়াছে ; ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিত, "যে তিনকুল খেয়ে ব্রহ্মচারী তার মরণ নাই।" কেহ বলিত, "রাখে হরি মারে কে ?"

হরির কৃপাতেই হউক বা নিজের অদৃষ্টবলেই হউক, এই মাতাপিতৃহীন অনাথ শিশু নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তখন কাহারও গরু চরাইয়া, কাহারও কাঠ কাটিয়া দিয়া, কাহারও বা বাজার করিয়া, হরিদাস জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। শেষে তাহার বাপের বন্ধু দীনু বসাক তাহাকে টানিয়া আনিয়া তাঁতের কাজ শিখাইতে লাগিল। তাঁতির ছেলে অল্পদিনের মধ্যেই মোটামুটি কাজ শিখিয়া ফেলিল, এবং পেটভাতায় দীনুর তাঁত বুনিয়া দিতে লাগিল। দুই বৎসর পরে দীনু তাহার দুই টাকা মাহিনা ধার্য্য করিয়া দিল।

হরিদাস পৈতৃকসম্পত্তির মধ্যে পাইয়াছিল, একখানি খড়ের ঘর, আর একখানি ভাঙ্গা বেহালা। তৈজসপত্র যাহা কিছু ছিল, বৃদ্ধার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। বহুদিন চালে খড় না পড়ায় ঘরখানি পড় পড় হইয়াছিল, হরিদাস মাহিনার টাকা জমাইয়া তাহার মেরামত করিল। আর মেরামত করিল, সেই ভাঙ্গা বেহালাখানিকে, অবসর পাইলেই সে গ্রামের আখ্‌ড়ায় গিয়া বাবাজীদের নিকট একটু একটু বেহালা শিখিয়া আসিত।

সঙ্গিহীন হরিদাস বেহালাখানিকেই আপনার সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল। স্বজনবিহীন শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন সে আপনাকে বড়ই একা বোধ করিত, জনাকীর্ণ সংসারের মধ্যে আপনার বলিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, যখন তাঁহার ক্ষুব্ধ হৃদয় মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইবার উপক্রম করিত, তখন সে সযত্নে বেহালাখানিকে বুকের উপর তুলিয়া লইত; দুই একবার কাণ তাহার মোচড়াইয়া তারের উপর ছড়ির ঘা মারিত, বেহালা ঝন্ ঝন্ শব্দে হাসিয়া উঠিত, কোঁ কঁা, পোঁ পঁা করিয়া কত কথা কহিত; হরিদাস মুহূর্ত্তে সকল দুঃখ, দৈন্য, শোক বিস্মৃত হইয়া, সাহানায় করুণ ঝঙ্কার তুলিয়া গাহিত :—

আর কতদিন থাক্‌ব হরি, একা আমি ঘোর আঁধারে।
শূন্য এ হৃদয় আসনে যতনে বসাব কারে।
একা কাঁদি একা হাসি, একা চোখের জলে ভাসি,
(আমার) সাধের চোখের জলের মালা এস হে পরাই তোমারে ॥

করুণ স্বরলহরী নৈশ বায়ুপ্রবাহে বাহিত হইয়া স্তব্ধ গ্রামখানির উপর মূর্চ্ছিত হইতে থাকিত; হরিদাসের হৃদয়ের শূন্যতা ধীরে ধীরে পূর্ণ হইয়া আসিত।

(২)

সে দিন গভীর রজনীতে হরিদাস যখন বেহালার সহিত আপনার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের করুণ উচ্ছ্বাস ঢালিতেছিল, তখন সহসা তাহার সঙ্গীত-ধ্বনি ডুবাইয়া নিতাই দাসের বাড়ী হইতে তুমুল ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। হরিদাস গান ছাড়িয়া বেহালা ফেলিয়া ছুটিল। গিয়া দেখিল, নিতাই দাস প্রায় মাসাধিক কাল রোগযন্ত্রণা ভোগের পর সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাহার স্ত্রী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া করুণ চীৎকারে

নৈশ গগন বিদীর্ণ করিতেছে, পাঁচ বৎসরের মেয়েটী মৃত পিতার পদপ্রান্তে পড়িয়া 'বাবা গো বাবা গো' বলিয়া কাঁদিতেছে।

হরিদাস বিধবাকে তুলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। ক্রমে পাড়ার আরও দুই চারিজন আসিয়া জুটিল। পাঁচজনের উদ্যোগে শবের সৎকারের আয়োজন হইল। পরদিন বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় সৎকার শেষ করিয়া সকলে ফিরিল, এবং শোকার্ত্তা বিধবাকে দুই চারিটা মিষ্টকথা বলিয়া যে যাহার ঘরে গেল। কেবল হরিদাস গেল না, এসময়ে এই অসহায়া বিধবাকে একা ফেলিয়া যাইতে পারিল না।

নিতাই স্ত্রীকন্যার জন্য কিছুই সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারে নাই। সে তাঁত বুনিয়া অতিকষ্টে সংসার চালাইত, মাঝে মাঝে দেনা করিতেও হইত; সে দেনার এক পয়সাও শোধ যায় নাই, তাহা সুদে আসলে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার উপর প্রায় একমাস রোগশয্যায় পড়িয়াছিল; এসময়েও কিছু ধার হইয়াছিল। সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর স্ত্রী কন্যা যে কি খাইবে, তাহার কোন উপায় ছিল না।

প্রতিবেশীরা ইহা শুনিল, শুনিয়া মৃত নিতায়ের বুদ্ধির উপর অনেক দোষারোপ করিয়া যে যাহার কাজে মন দিল। শিশু কন্যাসহ অনাথা বিধবার উপবাসের উপক্রম হইল। হরিদাস থাকিতে পারিল না, সে আপনার পুঁজি হইতে দুই চারি দিনের মত চাল ডাল আনিয়া দিল।

তারপর মহাজনেরা আসিয়া চাপিয়া বসিল। বিধবা ঘটী, বাটী, তাঁত, সব বেচিয়া, তাহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া কোনপ্রকারে মৃত স্বামীকে ঋণমুক্ত করিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই, জমার জমির উপর বাস, জমিদারের তিন বৎসরের খাজনা বাকী। জমিদার নালিশ করিয়া ডিক্রী করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে ডিক্রীজারি করিয়া বাড়ী ক্রোক করিল। বিধবা, কন্যার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী হইতে বাহির হইল।

গ্রামে যে দুই চারিজনের সহিত আত্মীয়তা ছিল, বিধবা তাহাদের দ্বারস্থ হইল; কিন্তু কেহই এই দুইটী গলগ্রহের ভার লইয়া সংসারে ব্যতিব্যস্ত হইতে রাজী হইল না। নিরাশ্রয়া বিধবা কন্যার সহিত পথে দাঁড়াইল।

হরিদাস আসিয়া বলিল, "খুড়ি (প্রতিবেশী সম্পর্কে নিতাই হরিদাসের পিতাকে দাদা বলিত), কোথায় আর যাবে? আমার ঘরে এস।"

বিধবা হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল; ভগবানের অপার করুণাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে হরিদাসের ঘরে গেল।

হরিদাস দেখিল, দুই টাকায় এই দুইটি পেট চলা কঠিন। সে চাকরী ছাড়িয়া দিল; যাহা কিছু জমাইয়াছিল, তাহা দিয়া একখানি তাঁত কিনিল; মহাজনের নিকট হইতে সূতা আনিল। বিধবা সংসারে কাজ করিত, রাঁধিত বাড়িত, সূতার পাট করিয়া দিত; হরিদাস দিনরাত বসিয়া তাঁত বুনিত। আর সেই ছোট মেয়েটী—সে হরিদাসের শূন্যগৃহে পূর্ণতার কল-ধ্বনি জাগাইয়া, তাহার উদাস হৃদয়ে উৎসাহের তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া বেড়াইত।

(৩)

সাত বৎসরের কালোকোলো মেয়ে; মেয়েটির নাম রাধা। রাধার গায়ের রঙটা একটু ময়লা হইলেও গড়নটি মন্দ নয়; কথাগুলি বেশ মিষ্ট, চলিবার ভঙ্গিটী বড় সুন্দর। সে যখন মধুর প্রভাতে, শুদ্ধ সন্ধ্যায় উঠানে আমগাছের ছায়ায় বসিয়া আপন মনে খেলা করিত, প্রজাপতির পাছু পাছু ছুটিত, তুচ্ছ কারণে করতালি দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত, তখন হরিদাসের নিরানন্দময় গৃহের উপর দিয়া আনন্দের একটা মধুর প্রবাহ বহিয়া যাইত, হরিদাস তাঁত বুনিতে বুনিতে পলকবিহীন

দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকিত, তাহার হাতের মাকু হাতেই রহিয়া যাইত। হায় রে, দগ্ধ মরুবক্ষে বিধাতা কেমন করিয়া এই ক্ষুদ্র ফুলটি ফুটাইয়া দিল!

রাধার আব্দার কিছু বেশী, আর সে আব্দারের বেগটা হরিদাসের উপরেই বেশী পড়িত। হরিদাসও তাহাতে নারাজ নহে, বরং সে তাহাতে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ, একটা চির অপরিচিত তৃপ্তি অনুভব করিত। রাধার ফুল চাই, হরিদাস গাছে উঠিয়া হাত পা ছিঁড়িয়া তাহাকে ফল পাড়িয়া দিত; রাধা ভাল মাছ না পাইলে ভাত খাইবে না, হরিদাস জাল লইয়া এ পুকুর ওপুকুর ছুটাছুটি করিত। বসাকদের কিশোরী চুড়ি পরিয়াছে, রাধারও রাঙ্গা চুড়ি চাই, নতুবা সে ভাতে বসিবে না. মা প্রথমে বুঝাইল, ভুলাইতে চেষ্টা করিল, শেষে প্রহার পর্য্যন্ত দিল, কিন্তু বালিকা নিজের জেদ ছাড়িল না; হরিদাস মধ্যাহ্নের রৌদ্রে একক্রোশ মাঠ ভাঙ্গিয়া, কৃষ্ণনগর হইতে রাঙ্গা চুড়ি আনিয়া দিয়া তাহাকে শান্ত করিল। রাধার মা ইহাতে বড় আপত্তি করিত. আশ্রিতের জন্য আশ্রয়দাতার এরূপ নিগ্রহ কে দেখিতে পারে? কিন্তু হরিদাস বলিত, "আহা, ও ছেলেমানুষ, কি জানে খুড়ী? ওকে দেখ্‌বার আর কে আছে?"

খুড়ী অঞ্চলপ্রান্তে চোখের কোণ মুছিয়া বলিত, "তা'ত বটে বাবা কিন্তু তোমার এই কষ্ট!"

বাধা দিয়া হরিদাস বলিত, "কষ্ট আর কি খুড়ী, আমার যদি নিজের ভাইবোন থাকৃত।"

খুড়ী ছল ছল চক্ষে বলিত, "তোমার ধার কখনো শুধ্‌তে পার্‌ব না বাবা।"

ঈষৎ হাসিয়া হরিদাস তাঁতে গিয়া বসিত।

নিঃসম্পর্কীয়া বিধবা ও তাহার ছোট মেয়েটির জন্য হরিদাস কেন এতটা করিত? কেন করিত, তাহা হরিদাস নিজেই জানে। চিরশুষ্ক নদ-গর্ভে সহসা বর্ষার প্লাবন পড়িলে সে বুঝি এমনই অজানিত আনন্দে নাচিয়া উঠে; তমোময় বিশাল প্রান্তরে চিরসঙ্গিহীন পথিক সহসা একটা ক্ষুদ্র সঙ্গী পাইলে, তাহার নিরানন্দময় অবসন্ন হৃদয় বুঝি ক্ষুদ্র সঙ্গীটিকে এমনই আবেগের সহিত হৃদয়ে টানিয়া লইতে চায়; ভূলুণ্ঠিতা ব্রততী সহসা একটী ক্ষুদ্র অবলম্বন পাইলে বুঝি এমনই অজানিত আনন্দে মাতিয়া তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া জড়াইয়া ধরে। এমনই একটা অজ্ঞাত মোহের প্রাবল্যেই বুঝি হরিদাস আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। তদ্ভিন্ন আর কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে ছিল না।

হরিদাস শুধু দেখিত, তাহার শান্তিশূন্য কঠোর দিনগুলা এখন আর তেমন উদাসভাবে বহিয়া যায় না, জঙ্গলাকীর্ণ উঠানে এখন আর একটা কুটাও পড়িয়া থাকে না, বাহির হইতে আসিয়া তাহাকে আর রুদ্ধ গৃহের হাহাকার শুনিতে হয় না। এখন তাহার ক্ষুদ্র গৃহখানি সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন, কলহাস্যে মুখরিত, শুষ্ক হৃদয়খানিও স্নেহে, মমতায় আনন্দে পূর্ণ। সে দেখিত, নিদাঘদগ্ধ উপবন বর্ষাবারি-সংস্পর্শে নবীন পুষ্পপল্লবে সজ্জাবিত হইয়াছে, চিরশুষ্ক উত্তপ্ত মরুবক্ষে নন্দনের কমনীয় শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এমনই ভাবে দিন কাটিতেছিল। সহসা একদিন রাধার মাতা হরি-দাসের শান্ত হৃদয়ে আশার একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিল।

একদিন রাধার মাতা গৃহাগতা কোন প্রতিবেশিনীর নিকট হরিদাসের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিল। উত্তরে প্রতিবেশিনী বলিল, "আহা, হরিদাস চিরদিনই বড় ভাল ছেলে, ভগবান্ ওকে ভালয় রাখুন, ও তোমাদের জন্যে কি না করেছে?"

রা—মা। সে কথা দু'বার বল্‌তে দিদি, হরিদাসের ধার আমি কখন শুধ্‌তে পার্‌ব না। এখন ওর হাতে মেয়েটাকে সঁপে দিতে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

হরিদাস তাঁত বুনিতেছিল, কথাটা তাহার কাণে গেল। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, হাতের মাকু বড় ঘন ঘন চলিতে লাগিল। ওদিকে টানার দুইগাছা সূতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার লক্ষ্য নাই।

(৪)

"রাধে, একটা পান সেজে নিয়ে এস তো।"

"তুমি আগে গল্প বল।"

"পান না দিলে আমি গল্প বল্‌ব না।"

"তবে আমিও পান দেব না।"

'কক্‌খনো দেবে না।"

"কক্‌খনো দেব না।"

"কক্‌খনো না?"

"কক্‌খনো না।"

হরিদাস মুখটাকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, "তবে আমি আর তোমার সঙ্গে কথা ক'ব না।"

রাধার ঠোঁটের উপর দিয়া একটু হাসির তরঙ্গ খেলিয়া গেল বলিল, "কক্‌খনো কইবে না?"

"কক্‌খনো না।"

"কক্‌খনো না?"

"কক্‌খনো না।"

হরিদাস মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে আপনার কাজে মন দিল। রাধা

ধীরে ধীরে গিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। হরিদাস সেদিকে ফিরিয়া চাহিল না। রাধা একগাছা সূতা ছিঁড়িয়া দিল, হরিদাস তাহাতে গাঁট দিয়া লইল; আবার সূতা ছিঁড়িল, আবার হরিদাস গাঁট দিল; আবার ছিঁড়িল, হরিদাস গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখ, এবার সূতো ছিঁড়লে ভাল হবে না।"

রাধা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া করতালি দিতে দিতে বলিল, "এই তো কথা কয়েছ?"

হরিদাস তাহাকে ধরিতে গেল, রাধা ছুটিয়া পলাইল।

একটু পরেই পিছনের জানালার ভিতর দিয়া এক খিলি পান আসিয়া হরিদাসের কোলের উপর পড়িল। হরিদাস পিছন ফিরিয়া চাহিল, রাধা ক্ষুদ্র দশনে অধর চাপিয়া, একটী ছোট কিল দেখাইয়া পলাইয়া গেল।

রাধা এখন আর নিতান্ত ছোট মেয়েটী নয়, একাদশবর্ষীয়া বালিকা। সে এখন কেবল খেলাধূলা লইয়াই ব্যস্ত থাকে না, সংসারের অনেক কাজকর্ম্ম করে; সূতা ফিরায়, হরিদাসকে পান সাজিয়া দেয়, তাহার বিছানা পাড়ে, তাহার সহিত বালসুলভ ঝগড়া করে; আর সন্ধ্যার পর হরিদাসের সম্মুখে মাদুর পাতিয়া শুইয়া গল্প শুনে। হরিদাস তাঁত বুনিতে বুনিতে গল্প করে, বালিকা তাহাই শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়ে। শ্রান্ত হরিদাস প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে এক একবার তাহার সুপ্ত মুখখানি দেখিয়া অশ্রান্তভাবে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাজ করিতে থাকে।

রাধা বড় হইয়া উঠিয়াছে, এবার শুভ কাজটা শেষ হইয়া গেলেই ভাল হয়। কিন্তু হরিদাস সে কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। পাড়ার কেহ পরিহাস করিয়া কথাটা তুলিলে রাধা লজ্জার হাসি হাসিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়; আর হরিদাস হৃদয়ে একরাশ আশার সহিত একটা তীব্র উদ্বেগ লইয়া দিন কাটায়। কিন্তু রাধার মা এবার শীঘ্রই

তাহার উদ্বেগের অবসান করিয়া দিল। একদিন কথায় কথায় বলিল, "বাবা হরি, মেয়ে তো বড় হয়ে উঠেছে, আর দেরী কেন? আসচে মাঘ মাসে শুভ কাজটা সেরে ফেলা যাক্।"

হরিদাস লজ্জায় মুখ নত করিয়া বলিল, "তা—তা—তুমি যেমন বল খুড়ী।"

খুড়ী বলিল, "কিন্তু বাবা, পাড়ার পাঁচ জনকে তো খুঁজ্‌তে হবে.—দু'দশ টাকা খরচ পড়্‌বে।"

হরি। তার জন্য চিন্তা কি? আমি টাকার যোগাড় দেখ্‌ছি।

হরিদাস উৎফুল্ল-হৃদয়ে টাকার সন্ধানে দীনু বসাকের নিকট চলিল। বাড়ীর বাহির হইতেই রাধার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তখন পুকুর হইতে জল আনিতেছিল। হরিদাসের ব্যস্তভাব দেখিয়া রাধা বলিল, "এত তাড়াতাড়ি কোথায়?"

হরিদাস সহাস্যে বলিল, "কোথায় বল দেখি?"

রাধা। তুমিই বল না।

হরি। টাকার চেষ্টায়।

রাধা। টাকা কি হবে?

হরি। আমার বিয়ে।

রাধাও একটু হাসিল; বলিল, "কবে? কোথায়?"

হরিদাস কোন উত্তর করিল না, কেবল মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল. আর রাধার মুখের উপর একটা হাস্যপূর্ণ কোমল কটাক্ষ স্থাপন করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে নিকটেই একখানা ছোট ইট পড়িয়া ছিল, সম্মুখে লক্ষ্য না থাকায় ইটখানা পায়ে বাধিয়া হরিদাস দড়াম্ করিয়া পড়িয়া গেল। রাধা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরিদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া, আর পিছনে না চাহিয়াই ছুটিয়া পলাইল।

(৫)

গ্রামে রাধার মাতার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল; তাহার নাম অদ্বৈতচরণ। সে রাধার মার ভগ্নীপতির পিসতুতো ভাই। বিধবা গৃহ-হীনা হইয়া একদিন অদ্বৈতচরণের দ্বারস্থ হইয়াছিল, অদ্বৈতচরণ সে সময়ে বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, পত্নীর দ্বারা তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছিল। এক্ষণে বহুদিনের পর অদ্বৈতচরণ সহসা রাধার ও তাহার মাতার সহিত আত্মীতা স্মরণ করিয়া তাহাদের তত্ত্ব লইতে উৎসুক হইল, লোক দিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল।

একদিন আহারান্তে রাধার মা অদ্বৈতচরণের বাটীতে উপস্থিত হইল। অদ্বৈতচরণ মহাযত্ন করিয়া শ্যালিকাকে বসাইল, তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল, এবং নিতায়ের মৃত্যুর পর হইতে এতাবৎকাল যে সে নিত্যই তাহাদের খোজখবর লইতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। তবে সংসারী লোক, নানা ঝঞ্চাটে ব্যস্ত থাকায় বিশেষ তত্ত্বাবধান বা দেখাশুনা করিতে পারে নাই, তজ্জন্য যথাসম্ভব দুঃখপ্রকাশ করিয়া বিধবাকে আপ্যায়িত করিল।

এইরূপে আপ্যায়িত করিয়া অদ্বৈতচরণ বলিল, "দিদি, মেয়েটী তো বড় হ'য়ে উঠেছে।"

বিধবা বলিল, "হাঁ, গেল ভাদ্রে বাছা আমার শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এগারয় পা দিয়েছে।"

অদ্বৈত। বেশ বেশ, তা এখন তার একটা বিয়ে-থার চেষ্টা তো দেখতে হবে। আর আমরা না দেখলেই বা দেখবে কে?

বিধবা। তা বটেই তো ভাই, যত হোক্ তোমরা আমার আপনার লোক। তবে কিনা সেটা এক রকম ঠিক হয়েই আছে।

অদ্বৈতচরণ যেন কিছুই জানে না, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, “বটে, বটে, তা বেশ হয়েছে। পাত্রটী কোথাকার?”

বিধবা। পাত্র আর কেউ নয়, আমাদের হরিদাস।

ভুই একবার মাথা নাড়িয়া, মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া অদ্বৈত-চরণ বলিল, “মন্দ নয়, পাত্রটী মন্দ নয়; যদিও তিনকুলে কেউ নাই, নাইও কিছু, তবু নেহাত মন্দ নয়।”

বিধবা একটু সন্দিগ্ধভাবে অদ্বৈতচরণের মুখের দিকে চাহিল। অদ্বৈত-চরণ বলিল, “তা এ দিকের সব চুকে গেছে তো? কি দেবে থোবে?”

মাথা নীচু করিয়া একটু মৃদুস্বরে বিধবা বলিল, “কিছুই না।”

“কিছুই না!” অদ্বৈতচরণ যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, “কিছুই না! বল কি দিদি, তুমি পাগল হয়েছ নাকি? এমন পরীর মত এগার বছরের মেয়ে, কত লোক লুফে নেয়; এদিকে ছেলের তো ‘ন মাতা ন পিতে ন বন্ধু,’ অথচ কিছুই দেবে না। তুমি যে আমাকে অবাক্ করলে।”

বিধবা তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। অদ্বৈতচরণ বলিল, “ছি ছি, ও সব পাগলামী ছেড়ে দাও; বলি নিজের কথা কিছু ভেবেছ কি? গতরটা কি চিরকালই চল্‌বে?”

বিধবা নিরুত্তর। অদ্বৈতচরণ বলিতে লাগিল, “পাগল আর কি! আমার কথা শুন, একটী ভাল পাত্র আছে, আমারই শালার ছেলে। ছেলে নয় তো, যেন কার্ত্তিক। মস্ত কারবার, চারখানা তাঁত চল্‌ছে। তারা দু'শো'র বেশী উঠ্‌তে চায় না, কিন্তু আমি তিনশো ক'রে দেব তুমি কি আমার পর? মেয়ে সুখে থাক্‌বে, দু'খানা গয়নাগাঁটী প'র্‌বে, তোমারও হাতে দু'পয়সার সংস্থান হবে। কিছু সংস্থান না থাক্‌লে এর পর তোমার হবে কি? পর কি তোমায় চিরকাল খেতে দেবে?”

একরাশ টাকার কথা শুনিয়া বিধবার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসের উপকারের কথা স্মরণ হওয়ায় চুপ করিয়া রহিল।

তখন অদ্বৈতচরণ দীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, হরিদাসের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে নানাদিকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। হরিদাসের আছে কি? মেয়েটাকে খাওয়াবে কি? দু'খানা গহনা দিতে পারবে? ঈশ্বর না করুন, যদি ছোঁড়াটার একটা ভালমন্দ হয়, তখন যে মেয়েকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। * * * ইত্যাদি,—সুতরাং এ সম্বন্ধ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, নাল্‌তেপুরে তাহার শ্যালকপুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

বিধবা বলিল, "কিন্তু হরিদাস যে এতদিন আমাদের খাওয়ালে পরালে, তার কি?"

অদ্বৈতচরণ বলিল, "আর তুমি যে এতদিন তার সংসারে দাসীর মত খাটলে তার কি? আমি তোমার ভালর জন্যই বল্‌ছি, যাতে তোমার হাতে দু'পয়সা আসে, তোমাকে পর-প্রত্যাশী হ'তে না হয়, তাই আমার ইচ্ছা। তুমি যে আমার আপনার লোক, তোমার ভালতে আমার ভাল। তা ছাড়া আমার এতে কোনই স্বার্থ নাই।"

সংসারে অদ্বৈতচরণের ন্যায় অনেক নিঃস্বার্থ পরোপকারী আছেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদেরই জয় জয়কার হইয়া থাকে। অদ্বৈতচরণেরও এ ক্ষেত্রে জয় হইল। শেষে স্থির হইল, অদ্বৈতচরণের কথামত কার্য্য হইবে, এবং বিধবা হরিদাসের গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়া তাঁহার গৃহে কর্ত্রীর ন্যায় বাস করিবে।

(৬)

রাত্রিতে হরিদাস যখন ভাত খাইতে বসিয়াছিল, তখন রাধার

মাতা কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা হরিদাস, একটা কথা বল্‌বো ?"

হরিদাস বলিল, "বল না খুড়ী।"

রা-মা। কিছু মনে কর্‌বে না তো ?

একটু বিস্মিত হইয়া হরিদাস বলিল, "মনে আবার কি কর্‌বো ?"

রা-মা। বাবা, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, মেয়েটাকে তোমার হাতেই দিই ; কিন্তু অনেকে বলে, এত বড় মেয়ে, অন্যত্র কর্‌লে কিছু পেতে পারি।

হরিদাস স্তম্ভিত হৃদয়ে খুড়ীর কথা শুনিতে লাগিল, তাহার হাতের গ্রাস হাতেই রহিল। খুড়ী বলিতে লাগিল, "এই নাল্‌তেপুরে একটী ছেলে আছে, খুব বড় ঘর, তিনশো টাকা দিতে চায়, মেয়েকে গহনা গাঁটিও দেবে। তা বাবা, আমি বলি কি, তুমি আমাদের জন্যে অনেক করেছ, আমি একশো টাকা ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি দু'শো দাও, আসছে মাসে কাজ শেষ করে ফেলি।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরিদাস বলিল, "দু'শো টাকা! এত টাকা কোথায় পাব খুড়ী ? আমার হাতে এক পয়সাও নাই।"

খুড়ী। তা হ'লে বাবা, কেমন করে কি হয় বল দেখি ? আমারও তো শেষের একটা সংস্থান চাই। চিরকাল যে তোমারই গলায় পড়ে থাক্‌ব, এমনই বা কি কথা ? তুমিই বল না।

হরিদাসের বুকের পাঁজরগুলা মড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিল ; স্থির দৃষ্টিতে খুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার কিছু বল্‌বার নাই খুড়ী ; তুমি যদি ভাল বলে মনে কর, রাধা যদি সুখে থাকে, তা হ'লে সেই খানেই—"

হরিদাস আর বলিতে পারিল না, তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল ;

খুড়ী প্রদীপটা উস্‌কাইয়া দিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, "তুমি যে এতে মত দেবে, তা আমি জানি। তোমার মত ছেলে কি আজকাল পাওয়া যায়।"

হরিদাস কোনপ্রকারে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেল।

(৭)

পরদিন হরিদাস তাঁতের কাছে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল। রাধা হাসিয়া বলিল, "আজ আমরা মেসোর বাড়ী যাব।"

হরিদাস মাথা না তুলিয়াই বলিল, "হুঁ।"

রাধা। তোমাকে ক'দিন একা থাক্‌তে হবে।

হরি। হুঁ।

রাধা। একা থাক্‌তে তোমার কষ্ট হবে না?

হরি। আমি চিরদিনই একা, রাধা!

রাধা দেখিল, হরিদাসের স্বরটা যেন কান্নায় ভরা। সে সহানুভূতির কোমলস্বরে বলিল, "আমরা আবার শীগ্‌গীর ফিরে আস্‌বো।"

হরিদাস মুখ তুলিয়া রাধার দিকে চাহিল। রাধা দেখিল, হরিদাসের মুখখানা যেন মরা মানুষের মুখের মত, চোক দু'টা ঘোর রক্তবর্ণ। রাধা একটু ভীত হইয়া বলিল, "তুমি আজ অমন ক'চ্চো কেন? তোমার চোক দু'টা অমন লাল কেন?"

মুখ নামাইয়া হরিদাস বলিল, "রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই। খুড়ী বুঝি তোমায় ডাকৃছে

রাধা চলিয়া গেল; হরিদাস সেইভাবে সেইখানে বসিয়া রহিল।

সেইদিন অপরাহ্ণে রাধার মাতা রাধাকে লইয়া হরিদাসের বাড়ী ত্যাগ করিল। হরিদাস রাধাকে চারিগাছি মল গড়াইয়া দিয়াছিল। মল রাধার পায়েই থাকিত; যাইবার সময় রাধার মা রাধার পা হইতে মলগুলি

খুলিয়া দিতে গেল। হরিদাস নিষেধ করিয়া বলিল, "না খুড়ি, ও মল আমি রাধাকে দিয়েছি, রাধার পায়েই থাক।"

হরিদাসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, রাধার হাত ধরিয়া খুড়ী চলিয়া গেল। হরিদাস স্পন্দহীন হৃদয়ে, স্থির শুষ্কদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শীতের স্তব্ধ সন্ধ্যা ক্রমে ঘনাইয়া আসিল; তরল কুজ্ঝটিকায় পথ, ঘাট ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইল। হরিদাস স্পন্দহীন দৃষ্টিতে ধূমাচ্ছন্ন পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বাড়ীর পাশ দিয়া কে তখন গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"এত সাধের বাগান আমার ফুট্‌লো নাকো ফুল।"

বিধবা

(১)

সেদিন প্রভাতে বামুনপাড়া গ্রামখানা যেরূপ বিরাট উৎসাহ ও তুমুল কোলাহল সহকারে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবে সে আর কখনও জাগে নাই। গ্রামের ত্রিলোচন বিদ্যানিধি মহাশয়ের টোলেও সেদিন অদৃষ্টপূর্ব্ব লোকসমারোহ হইয়াছিল। সেই সমুৎসুক জনমণ্ডলীর সমক্ষে বিদ্যানিধি মহাশয় সেদিন যেরূপ প্রবল উৎসাহ সহকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেরূপ পাণ্ডিত্য তিনি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার অপূর্ব্ব শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে জনমণ্ডলী বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; টোলের ছাত্রবৃন্দ এই অগাধ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকারে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিল।

গ্রামখানির এরূপ বিরাট জাগরণের, বিদ্যানিধি মহাশয়ের এরূপ অপূর্ব্ব শাস্ত্রব্যাখ্যার অবশ্যই একটী কারণ ছিল। কারণটাও বড় গুরুতর। ৺রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র বংশধর শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, সম্প্রতি একটী পঞ্চদশবর্ষীয়া বালবিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া চট্টোপাধ্যায়-কুলে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা এবং নব্যসমাজের সমক্ষে আপনার সৎসাহসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারই বিরুদ্ধে এই বিরাট আন্দোলন, এবং বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিশাল শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন দ্বারা সদ্ব্যবস্থারূপ অমৃত আহরণ।

কিন্তু গ্রামের সকলেই যে এই দেবদুর্লভ অমৃতের প্রসাদার্থী ছিল তাহা নহে। আর তাহা হইলে আন্দোলনও এত প্রবলভাব ধারণ করিতে পারিত না। ইহার মধ্যে দুইটা দল ছিল; এক দলে কয়েকজন নব্যশিক্ষিত যুবক—তাঁহারা বিধবাবিবাহের পৃষ্ঠপোষক; অপর পক্ষে প্রাচীনের দল; তাঁহারা এই বেদবিধিবিগর্হিত আচরণের উপর খড়্গহস্ত।

কিন্তু তাঁহাদের মতামতে কি আসে যায়? বিদ্যানিধি মহাশয়ই গ্রামের মাথা, সমাজের নেতা, ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাদাতা। বিদ্যানিধি মহাশয় ইহারও যথোচিত ব্যবস্থা দিলেন। তিনি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া প্রমাণিত করিলেন যে, বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়; কেবল অশাস্ত্রীয় নহে, সমাজের ঘোর অনিষ্টকর; ইহা দ্বারা হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা বিনষ্ট হইবে, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিবে; সমাজ যাইবে, গার্হস্থ্য সুখশান্তি তিরোহিত হইবে, সংসার রসাতলে যাইবে। বিধবা হিন্দুসমাজে মূর্ত্তিমতী দেবী; বিবাহ দিয়া তাহার দেবীত্ব নষ্ট না করিয়া তাহার চরিত্রকে আরও উন্নত করিতে চেষ্টা কর; তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও, সংযম শিখাইয়া তাহার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের উপায় বিধান কর; তাহাকে সম্মান দেখাইয়া, তাহার আদর্শে আপনাদিগকে গঠিত করিয়া হিন্দুসমাজকে পবিত্র কর, ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত কর। বিদ্যাসাগর নিতান্ত অর্ব্বাচীন, শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য, অদূরদর্শী, তাই এমন একটা অকাণ্ডের সূচনা করিয়া হিন্দুসমাজকে রসাতলে দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন···ইত্যাদি।

ধন্য ধন্য রবে বিদ্যানিধি মহাশয়ের শ্রুতিযুগল রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। এদিকে সূর্য্যদেব মধ্যগগনে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন, বক্তার ও শ্রোতৃবর্গের জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় স্নানার্থ গমন করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীও সন্ধ্যাসমাগমে নীড়াভিমুখী বিহঙ্গমকুলের ন্যায় ব্যক্তাব্যক্ত বিবিধ স্বরে

গ্রাম্যপথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত আর নাই; তাঁহার উক্তিগুলি 'ষষ্ঠবেদ' নামে অভিহিত হইতে পারে। কেবল ছিদ্রান্বেষী কয়েকজন যুবক বলিলেন যে, ইহা প্রমথকুমার শর্ম্মার 'বিধবা-বিবাহ প্রতিবাদে'র পুনরুক্তি মাত্র।

(২)

"গৌরি!"

স্নানান্তে পূজার ঘরে ঢুকিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় উগ্রস্বরে ডাকিলেন, "গৌরি!"

রন্ধনশালা হইতে গৌরী উত্তর করিল, "কেন দাদা?"

"বলি এসব হয়েছে কি?"

ভয়চকিত স্বরে গৌরী বলিল, "কেন, কি হয়েছে?"

সপ্তমে স্বর চড়াইয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "হয়েছে আমার মাথা মুণ্ড, আর তোমার শ্রাদ্ধ।"

গৌরী তখন ডাউল সাঁতলাইবার জন্য হাঁড়িতে তেল দিয়াছিল; দাদার তর্জ্জন শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাহাতে ডাউল ঢালিয়া দিল। খানিকটা গরম ডাউল তাহার হাতে লাগিল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া গৌরী হাত ধুইয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গেল।

বিদ্যানিধি মহাশয় রক্তনেত্রে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এমনি ক'রে বুঝি পূজার যো' করতে হয়?"

গৌরী দেখিল, দাদার ক্রোধ অকারণ নহে। কোশায় জল নাই, পুষ্পপাত্রে চন্দন নাই, শিবপূজার মৃত্তিকা শুষ্ক, বসিবার আসন এককোণে জড় করা। বিদ্যানিধি বলিলেন, "এ কি হয়েছে?"

গৌরী নিম্নস্বরে বলিল, "বৌ ঠাকুরঘরে এসেছিল।"

গৌরী তাড়াতাড়ি চন্দন ঘষিতে বসিল। বিদ্যানিধি কর্কশ স্বরে বলিলেন, "কেন, তুমি কোন্ যমালয়ে গিয়েছিলে ?"

গৌরী। ঘরের পাট সারতে বেলা হয়ে গেল, তাই বৌকে ব'লে তাড়াতাড়ি রাঁধতে—

দন্তভঙ্গী করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "তাই তাড়াতাড়ি আমার পিণ্ডদানের যোগাড়ে গিয়েছিলে ! একজনের ত সকাল সকাল পিণ্ড দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ, আবার আমারও সকাল সকাল পিণ্ড দেবার ইচ্ছা আছে না কি ?"

গৌরী একবার কাতর দৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া নতমুখে চন্দন ঘষিতে লাগিল। চোখ দুইটা তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, গৌরী বহুকষ্টে তাহা রোধ করিল। কিন্তু পুষ্পপাত্রে চন্দন দিবার সময় এক ফোঁটা চোখের জল কোন বাধা না মানিয়া একটী রক্তকরবী ফুলের উপর পড়িল। লাল ফুলের উপর স্ফটিকস্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু ঢল ঢল করিতে লাগিল। গৌরী তাড়াতাড়ি ফুলটা তুলিয়া ফেলিয়া দিল।

এমন সময় রন্ধনশালা হইতে একটা বিকট দুর্গন্ধ বাহির হইল। বিদ্যানিধিগৃহিণী বরদাসুন্দরী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সব গেল যে ! বলি হচ্চে কি ? পোড়া নাকও কি নাই ?"

গৌরী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ছুটিয়া আসিল; দেখিল, ডাউল হাঁড়িতে ধরিয়া পুড়িতেছে। বরদাসুন্দরী শয়নগৃহের দাবায় বসিয়া খোকাকে স্তনপান করাইতেছেন, আর গৌরী যে ইদানীং নিতান্ত স্বার্থপরায়ণা এবং অলসস্বভাবা হইয়া পড়িয়াছে, তাহার যে আর কাহাকেও সুখে স্বচ্ছন্দে খাইতে দিবার আদৌ ইচ্ছা নাই, ইহাই বেশ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন।

সে সকল কথায় গৌরী কাণ দিল না। সে নীরবে আপনার কাজ

করিতে লাগিল। তাহাকে উত্তরদানে বিরত দেখিয়া বরদাসুন্দরী অগত্যা নিরস্ত হইলেন। এত শীঘ্র নিরস্ত হইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এক পক্ষ নীরব থাকিলে অপর পক্ষ কতক্ষণ বাক্‌চাতুরী প্রকাশ করিতে পারে? সুতরাং এক্ষেত্রে গৌরীরই জয় হইল।

তারপর আহারের সময় গৌরীকে আবার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার নিকট যথাশাস্ত্র তিরস্কার বাণী শুনিতে হইল। ডাউলের অভাবে বরদা-সুন্দরীর ত সেদিন খাওয়াই হইল না।

সকলের আহারাদি শেষ হইলে গৌরী আহ্নিক সারিয়া আপনার হবিষ্যান্ন চড়াইল। তখন প্রাঙ্গণস্থ নারিকেল গাছের ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। গৌরী আহারে বসিয়া সবে মাত্র এক গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়াছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, গৃহিণী বিদ্যানিধিকে উপলক্ষ্য করিয়া গৌরীকে শুনাইয়া বলিতেছে, "একটা সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এবার আমার সংসার জ্বালাতে এসেছে। আমাদের খেতে দেখ্‌লে হিংসেয় জ্বলে মরে, তাই ইচ্ছে ক'রে ভাত তরকারি পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু নিজের পিণ্ডীর রাশিটা একবার দেখ না গিয়ে।"

বিদ্যানিধি সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "হুঁ।"

গৌরীর আর খাওয়া হইল না। তাহার রুদ্ধ শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল, মুখের ভাত বাহির হইয়া আসিতে লাগিল; চোখের জলে পাতের ভাত ভিজিয়া গেল। গৌরী ভাতগুলি তুলিয়া লইয়া পুকুরের জলে ঢালিয়া দিয়া আসিল। পরদিন যে একাদশী, তাহা তাহার মনেই রহিল না।

বিদ্যানিধি মহাশয় তখন গৃহিণীর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া হিন্দুর সংসারে দেবীরূপিণী বিধবার অসীম মাহাত্ম্য প্রদর্শন জন্য মনু, অত্রি, পরাশর লইয়া গভীর গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন।

(৩)

রাত্রিতে সকলে যখন নিদ্রাগত, গৌরী তখন আপনার বিছানায় পড়িয়া আছে। ঘুমায় নাই, জাগিয়া আছে—কাঁদিতেছে। আজিকার ঘটনায় যে সে কাঁদিতেছে তাহা নহে, এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে, এমন তিরস্কার, এমন অনাহার তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু একটা কথা, বিদ্যানিধি মহাশয়ের একটা মর্ম্মভেদী বাক্য গৌরীর বুকে আজ বড় বাজিয়াছে। "এক জনের ত সকাল সকাল পিণ্ড দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ, আবার আমারও সকাল সকাল পিণ্ড দেবার ইচ্ছা আছে না কি?" গৌরী সকাল সকাল একজনের পিণ্ড দিয়াছে? গৌরী ভাবিতেছে, "সে কে? সে দেখিতে কেমন?" গৌরী আপনার সমস্ত হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, সেখানে কাহাকেও পাইল না। মানসনেত্র উন্মীলন করিয়া সংসারময় চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কেহই তাহার আকুল দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। গৌরী তখন মনে মনে ডাকিল, "কে তুমি দেবতা, তোমাকে যে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! কবে তুমি এ হৃদয়াসনে আসিয়া বসিয়াছিলে? আবার কবেই বা সে আসন শূন্য করিয়া চলিয়া গেলে? গেলে ত একটু পদাঙ্কও রাখিয়া গেলে না কেন? আমি যে তোমার সেই পদচিহ্নটুকু বুকে ধরিয়া সংসারের সকল দুঃখ—সকল যন্ত্রণা বুক পাতিয়া লইতে পারিতাম। হায় প্রভু! আমার যে কিছুই নাই, কেহই নাই, কাহার চরণে আমি আমার চোখের জল ঢালিব? কে আসিয়া আমার চোখের জল মুছাইবে?"

গৌরী পড়িয়া পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল।

সাত বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়া গৌরী আট বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। বিবাহের সময় সে তিনদিন মাত্র শ্বশুরালয়ে ছিল। কিন্তু সে সেই বিবাহের কথা, সেই তিন দিনের পরিচিত

শশুরালয় কিছুতেই মনে আনিতে পারে নাই। স্বামী কেমন, তাহাকে সে কখন দেখিয়াছিল কি না, তাহা গৌরী কিছুই জানে না।

বিধবা হইয়া অবধি গৌরী পিত্রালয়েই রহিল। তখন মাতাপিতা উভয়েই জীবিত। তারপর তাঁহারা একে একে সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। গৌরী বড় কাঁদিল, কিন্তু ভ্রাতার মুখ চাহিয়া আবার শান্ত হইল। তারপর ভ্রাতৃজায়া আসিল। গৌরী নিজে গৃহিণী হইয়া ভ্রাতৃজায়াকে গৃহিণীপণা শিখাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন শিক্ষকের পদে থাকিতে হইল না, অচিরাৎ একটী পুত্র প্রসব করিয়াই বরদাসুন্দরী স্বয়ং শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন, ননদ আবার শিষ্যের স্থান অধিকার করিল। তখন গৌরীর বড় একটা গোলমাল হইয়া গেল। বড় সাধ করিয়া ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতুষ্পুত্র লইয়া যে সংসার পাতিয়া বসিয়া[illegible]থা হইতে বিতাড়িত হইল। তবে ইহাতেও গৌরী বড় বেশী ক্ষাত বোধ করিল না; ভাবিল, হউক না কেন, সংসার বজায় থাকিলেই হইল; আমার সংসার ত বটে!

কিন্তু আর কিছুদিন পরেই গৌরী দেখিল, এখানে তাহার আমার বলিবার কিছুই নাই, সে এ সংসারের কেহই নহে। সংসারে একটা দাসীর যতটুকু অধিকার থাকে, তাহার ততটুকু অধিকারও নাই। দাসী প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া উপযুক্ত বেতন পায়, কিন্তু গৌরী পায় কেবল ভ্রাতৃজায়ার তীব্র তিরস্কার, আর ভ্রাতার কটূক্তি। দাসী ইচ্ছা করিলে অন্যত্র যাইতে পারে, কিন্তু গৌরীর আর কোথাও যাইবার স্থান নাই। দাসী পাঁচটা কথা সহ্য করিয়া একটা কথাও শুনাইয়া দেয়, কিন্তু গৌরীর একটা কথা বলিবারও অধিকার নাই, তাহাকে নীরবে সমস্ত বাক্যবাণ সহ্য করিতে হয়। নিতান্ত অসহ্য হইলে গৌরী কাঁদিত;

প্রকাশ্যে নয়—নির্জ্জনে কাঁদিত। কিন্তু অনাথা বিধবার সে চোখের জল কে দেখিবে? কে তাহা মুছাইয়া দিবে?

আজিও গৌরী নির্জ্জনে কাঁদিতেছিল; কেবল দুইটী উজ্জ্বল তারকা দূর নীলাম্বরে বসিয়া গবাক্ষপথে তাহার চোখের জল দেখিতেছিল; কেবল ধীর নৈশ বায়ু তাহার তপ্ত ললাটে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল।

(৪)

"ওঠ না পিসি মা, বেলা হয়েছে যে!"

দুই দিনের উপবাসে অবসন্ন হইয়া গৌরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাই দ্বাদশীর প্রভাতে ভ্রাতুষ্পুত্র দুলাল তাহার ঘরের দরজা ঠেলিয়া ডাকিতেছিল, "ওঠ না পিসি মা, বেলা হয়েছে যে!"

গৌরী চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল, প্রভাত-সূর্য্যকিরণ তাহার শয্যা স্পর্শ করিতেছে। গৌরী ব্যস্তসমস্ত হইয়া যেমন শয্যা হইতে নামিতে যাইবে, অমনি তাহার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। গৌরী বুক ধরিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

দুলাল ডাকিল, "পিসি মা, পিসি মা!"

গৌরীর উত্তর দিবার শক্তি নাই; তাহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। দুলাল আবার ডাকিল, "পিসি মা!"

সরলাসুন্দরী তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "কেন ডাকাডাকি করছিস্? সারা রাত জেগেছে, সকালে একটু ঘুমাক।"

গৌরীর বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। সে নিশ্বাসের সঙ্গে তাহার বুকের হাড়গুলা যেন মড় মড় করিয়া উঠিল। গৌরী ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার খুলিল, কিন্তু দ্বারের বাহিরে আসিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িল।

দুলাল বলিল, "ওকি পিসি মা, অমন ক'রে ব'সে পড়লে কেন? কি হয়েছে পিসি মা?"

রুদ্ধশ্বাসে বহুকষ্টে গৌরী ডাকিল, "দুলাল!"

দুলাল পিসিমার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কেন পিসি মা?"

দুলালের হাতখানি লইয়া গৌরী আপনার বুকের উপর রাখিল।

বরদাসুন্দরী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দুলাল, তোর কি এখনও পাঠশালে যাবার বেলা হয় নি?"

দুলাল একবার পিসিমার যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে, একবার মাতার তীব্র কটাক্ষের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

কিছুক্ষণ পরে বুকের ব্যথাটা একটু কমিয়া আসিলে গৌরী উঠিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইল।

(৫)

বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাড়ীর অনতিদূরে মল্লিকদের পুকুর। পুকুরের জল বেশ পরিষ্কার, কাকচক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; দুই দিকে দুইটা ঘাট বাঁধান, পাড়ের উপর কয়েকটা অশ্বথ, বট ও তালগাছ। জল ভাল বলিয়া গ্রামের অধিকাংশ লোকই পানের জন্য এই জল ব্যবহার করিত। প্রত্যহ অপরাহ্ণে বামাকুলের কলঝঙ্কারে ঘাট দুইটী মুখরিত হইত, অনেক সুন্দরীর মুখপদ্ম স্বচ্ছ কৃষ্ণসলিলে ভাসমান হইয়া পুষ্করিণীর পদ্মের অভাব পূর্ণ করিয়া দিত।

ঘরের কাজ শেষ করিতে বিলম্ব হওয়ায় সেদিন গৌরী যখন ঘাটে আসিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, জলার্থিনী কামিনীরা জল লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের পরিত্যাগে ব্যথিত সরোবর অভিমানে কৃষ্ণসলিলের উপর অন্ধকারের আবরণ টানিয়া দিতেছে।

গৌরী তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া কলসীতে জল ভরিয়া ঘাটের উপরে

উঠিল। সহসা পাশের বটগাছের আড়াল হইতে কে যেন শীষ দিল। গৌরী সেদিকে না চাহিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতগমনে পাড় হইতে নামিল। আবার শীষের শব্দ; কিন্তু শব্দ এবার পশ্চাতে নহে সম্মুখে। গৌরী থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সম্মুখে শিমুলগাছের পাশ হইতে একটা লোক বাহির হইতেছে। গৌরী ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। ক্ষণপরেই লোকটা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। গৌরী দেখিল, সে মল্লিকদের স্থরেন।

স্থরেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে গৌরীর মুখের দিকে চাহিল। গৌরী ভীত হইয়া বলিল, "পথ ছেড়ে দাও।"

স্থরেন বলিল, "ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। আমি কেবল তোমাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি। আমাদের ছেলে-বেলার কথা মনে পড়ে গৌরি!"

গৌরী দৃঢ়স্বরে বলিল, "পথ ছাড়; মনে রেখো, আমি বিধবা রমণী।"

স্থরেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তুমি বিধবা বলিয়াই ত আমার দুঃখ; গৌরি, তুমি কি স্থখে থাক্‌তে চাও না?"

গৌরী আবার বজ্রকণ্ঠে বলিল, "এখনও বলছি, পথ ছেড়ে দাও।"

স্থরেন বলিল, "পথ ছাড়িতেছি; কিন্তু তুমি কতদিন আর—"

সহসা দূরে দীর্ঘাকার মনুষ্যাবয়ব দৃষ্টি করিয়া স্থরেন ছুটিয়া পলাইল; গৌরী কম্পিতচরণে গৃহে ফিরিল।

* * * *

সন্ধ্যার পর বিদ্যানিধি ডাকিলেন, "গৌরি!"

সে স্বরে চমকিত হইয়া গৌরী ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যা-নিধি বলিলেন, "আজ জল আন্‌বার সময় কা'র সঙ্গে কথা হচ্ছিল?"

গৌরীর বুক কাঁপিয়া উঠিল ; সে নতবদনে নিরুত্তর রহিল ।

বিদ্যা। কে সে হতভাগা ? পথে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কি কথা ?

গৌরী নিরুত্তর। নেপথ্য হইতে বরদাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, "মুখে আগুন, মুখে আগুন !"

বিদ্যা। সব বুঝেছি ; এখন তুমি দূর হও, তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শনেও পাপ আছে ।

কম্পিতকণ্ঠে গৌরী বলিল, "আমার কোন দোষ নাই ।"

রাগে চক্ষু কপালে তুলিয়া বিদ্যানিধি বলিলেন, "তোর দোষ নয়তো কি আমার দোষ ? হতভাগী, আমাকে আবার দোষ গুণ বুঝাইতে আসিয়াছ ? আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, এখন আমার বাড়ী হ'তে দূর হও ।"

ক্রন্দনবিজড়িতস্বরে গৌরী বলিল, "কোথায় যাব ?"

বিদ্যা। চুলোয়, যমালয়ে, যে পুকুর হ'তে জল আন্‌ছিলে, সেই পুকুরে—

গৌরী আপনার ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, "কে কোথায় আছ দেবতা, আমায় রক্ষা কর, আত্ম-হত্যার পাপ হ'তে আমায় বাঁচাও ।"

(৬)

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরাতীত। বিদ্যানিধি মহাশয় গৃহিণীর সহিত সুখশয্যায় শয়ন করিয়া সুপ্তিসুখ অনুভব করিতেছেন। জগৎ সুষুপ্ত। কেবল গৌরী একা ছাদের উপর জাগিয়া বসিয়া আছে। আকাশে চাঁদ নাই, নক্ষত্র নাই, নিদাঘের নিবিড় নীরদমালায় আকাশ সমাচ্ছন্ন, গ্রাম, নগর, বৃক্ষলতা গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। গৌরী সেই প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন দিগন্তের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, এই ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায়

তাহারও বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ গাঢ় তিমিরে আবৃত; এই অন্ধকারময়ী ধরণীর ন্যায় তাহার হৃদয়ও দুর্ভেদ্য আঁধারে ঢাকা। সেখানে একটুও আলো নাই, একটুও আশা নাই, একবিন্দু সান্ত্বনা নাই! সে সংসারের পরিত্যক্তা অনাথা বিধবা—বিধাতার অভিশাপগ্রস্তা চিরদুঃখিনী কন্যা! কিন্তু কেন—কি দোষে তাহার এত কষ্ট, এই ভীষণ শাস্তি; বাল্য, কিশোর, যৌবন,—কোন কালেই তো সে কোন পাপ করে নাই, তবে কোন্ মহা অপরাধে এই ভীম দণ্ড তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইতেছে? কোন্ পাপে এত বড় সংসারে আজি তাহার জন্য এতটুকু স্থান নাই, এতটুকু মমতা নাই, এতটুকু সান্ত্বনা নাই? বলিয়া দাও ভগবান! সে কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? প্রভাতে গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়া সে কোথায় দাঁড়াইবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? তাহার রূপ আছে, বয়স আছে; সংসারের চারিদিকে শত প্রলোভন অসংখ্য বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। কে তাহাদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে? আত্মহত্যা—আত্মহত্যা মহাপাপ। সে মহাভারতে শুনিয়াছে, আত্মঘাতী ব্যক্তি কুম্ভীপাক নামক ভীষণ নরকে কোটিকল্পকাল দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করে। তবে সে কোথায় যাইবে? কে. কোথায় আছ, বলিয়া দাও, অভাগিনী অনাথা বিধবা কোথায় যাইবে?

কড় কড় শব্দে আকাশ গর্জ্জিয়া উঠিল; প্রবল বৃষ্টিধারা মাথায় লইয়া বায়ু উদ্দামবেগে ছুটিল, বিদ্যুতের তীব্রবিকাশে চক্ষু ঝলসিয়া গেল। গৌরী দুই হাতে বুক চাপিয়া ছাদের উপর বসিয়া রহিল, তাহার মাথার উপর দিয়া প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা চলিতে লাগিল।

(৭)

প্রভাতে উঠিয়া বিদ্যানিধি দেখিলেন, গৌরী একা ছাদের উপর অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র, চক্ষুর্দ্বয় ঘোর

রক্তবর্ণ, গাত্র হইতে জলন্ত অগ্নির ন্যায় উত্তাপ বাহির হইতেছে। ধরাধরি করিয়া তাহাকে নীচে নামান হইল। বরদাসুন্দরী বলিলেন, "মুখে আগুন, আবার ঢং ক'রে ছাদে পড়ে বৃষ্টিতে ভেজা হয়েছে। নষ্টের চরিত বুঝা ভার! এখন আবার ডাক্তারের জন্যে টাকা বের কর।"

বরদাসুন্দরীর আশঙ্কা ফলবতী হইল না, গৌরীর জন্য ডাক্তার আসিল না। হিন্দুর ঘরের বিধবাকে ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট অপবিত্র জল খাওয়াইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে? একে প্রবল জর, তাহার উপর বুকের বেদনা; গৌরী একা শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিত। প্রায় সর্ব্বক্ষণই অচেতন অবস্থায় থাকিত; যখন চৈতন্য হইত, তখন করুণস্বরে চীৎকার করিয়া বলিত, "পথ ছেড়ে দাও, এখনো বল্‌ছি, পথ ছেড়ে দাও।" কখন বা বলিত, "দাদা, আমায় মেরো না, আমার কোন দোষ নাই, আমাকে তাড়িয়ে দিও না।" কখন বা তৃষ্ণার যন্ত্রণায় জল জল বলিয়া চীৎকার করিত। দুলাল মাঝে মাঝে গিয়া পিসিমার কাছে বসিত, জল দিত, কিন্তু মাতার ভয়ে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিত না। আর বিদ্যানিধি মহাশয় বিধবাবিবাহকারী সুবোধচন্দ্রকে সমাজচ্যুত করিতে ব্যস্ত, তাঁহার রোগীকে দেখিবার সময় কোথায়?

তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার পর গৌরী ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "দুলাল, বাপ!"

"কেন পিসি মা!"

"আমি যাই বাবা।"

"তুমি কোথায় যাবে পিসি মা, আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

গৌরীর আর বেশী কথা কহিবার শক্তি ছিল না, ক্রমেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; মৃত্যুর করাল ছায়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া ফেলিতেছিল।

দুলালের কথায় গৌরীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল; সে বহুকষ্টে

আপনার হাতখানি দুলালের মাথায় রাখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর স্বরে বলিল, "বাবা আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।"

দুলাল কাতরস্বরে বলিল, "তুমি অমন করছ কেন পিসি মা!"

বাহির হইতে বরদাসুন্দরী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দুলাল, রাত জেগে জেগে তুই কি একটা কাণ্ড না করে ছাড়বি না?"

গৌরীর কোটরগত চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া শুষ্ক গণ্ডে পতিত হইল। দুলাল মাতার শাসনে ধীরে ধীরে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিল।

ঠিক সেই সময়ে একব্যক্তি আসিয়া বিদ্যানিধির পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

আগন্তুক সেই সুরেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বিস্মিত হইয়া ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। তখন সুরেন যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম্ম এই-রূপ,—বিদ্যানিধি মহাশয় সুবোধচন্দ্রকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করায় বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী কয়েকজন যুবক বিদ্যানিধির উপর খড়্গহস্ত হন এবং মিথ্যা অপবাদে তাঁহাকে কলঙ্কিত করিবার জন্য সেই দলের অন্যতম নেতা সুরেন সেদিন সন্ধ্যাকালে গৌরীর পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। ঘটনাক্রমে বিদ্যানিধি মহাশয়ও সেই সময়ে সেই পথে উপস্থিত হওয়ায় তাহার অভীষ্ট সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহার পর যখন সে শুনিল যে, গৌরী তাহার চক্রান্তের ফলে রোগশয্যায় পড়িয়া কেবল "পথ ছাড়, পথ ছাড়" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন সে আপনার অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিল, তাহার হৃদয়ে তীব্র অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বিদ্যানিধির ও গৌরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন, এবং উভয়ে ধীরে ধীরে গৌরীর কক্ষে প্রবেশ

করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৌরীর যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান হইয়াছে, মৃত্যু আসিয়া অনাথা বিধবার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে !

ক্ষমাহীন অপরাধের দুর্বিষহ যাতনা হৃদয়ে চাপিয়া সুরেন বিধবার মৃত্যুমলিন মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সম্পূর্ণ।

গৃহস্থ-গ্রন্থাবলী

১। বিশ্ব-শক্তি (দেশের ও দশের কথায় পরিপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থ)
—মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা।

২। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী (কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের সমগ্র কবিতার সমালোচনা) —মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

৩। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ (শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবমুখনিঃসৃত উপদেশাষ্টক) —মূল্য ৵০ দুই আনা।

৪। বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, প্রণীত
—মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

৫। কমলা (গার্হস্থ্য উপন্যাস)—মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা।

৬। পাগল (একাধারে প্রেমভক্তি ও তত্ত্বকথার সমন্বয়)
—মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

৭। নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর (নিগ্রোনায়ক বুকার ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিত) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, প্রণীত
—১৷০ একটাকা আট আনা।

৮। বর্ত্তমান জগৎ প্রথম খণ্ড, মিশর
—মূল্য ১৷০ একটাকা আট আনা।

৯। বর্ত্তমান জগৎ দ্বিতীয় খণ্ড, ইংরাজের জন্মভূমি
মূল্য ২৷০ দুই টাকা আট আনা।

১০। বঙ্গীয় পতিতজাতির কর্ম্মী শ্রীহরিদাস পালিত প্রণীত
—মূল্য ১৲ এক টাকা।

১১। চান্দেলী (ঐতিহাসিক উপন্যাস) —মূল্য ৸০ বার আনা।

১২। সোনার দেশ (সচিত্র শিশুপাঠ্য গ্রন্থ)—মূল্য ।০ চারি আনা।

১৩। বিসূচিকা-দর্পণ ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম, ডি প্রণীত
—মূল্য ২৷০ দুই টাকা আট আনা।

গৃহস্থ পাব্লিসিং হাউস্
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা।